# বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (১৯০৯-১৯৯৮)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল (ইতিহাস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র


তত্ত্বাবধায়কঃ অধ্যাপক ড: শুভাশিস বিশ্বাস

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

অভিষেক নস্কর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়



শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যাঃ ০০১৭০০৬০৩০০৬

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১২৮৫৫৪ (২০১৪-২০১৫)

Certified that the thesis entitled "বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (১৯০৯-১৯৯৮)", Submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Masters of Philosophy [Arts] in the Department of HIstory of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that that work has not been submitted by me for the award any other degree / diploma of the same institution where the work is carried out, or to any other institution.

Name of the Student : Abhishek Naskar

Roll No : 001700603006

Registration No : 128554 of 2014-15

EXAM. ROLL NO : MPHS194006

On the basis of Academic merit and satisfying all criteria as declared above, the dissertation work of Mr. Abhishek Naskar entitled "বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (১৯০৯-১৯৯৮)", is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy [Arts] in the Department of History of Jadavpur University.

7/5/19

Head, Department of History

Head
Department of History
Jadavpur University
Kolkata- 700 032

7/5/19

Supervisor and Convener of RAC

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

7/5

Member of RAC

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata – 700 032

# CERTIFICATE

This is to certify that Shri Abhishek Naskar has carried out his research for the preparation of M.Phil dissertation titled " বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (১৯০৯-১৯৯৮)" under my Supervision, his class Roll No. is 001700603006.

Supervisor

DR. Subhasis Biswas

Department of History

Jadavpur University

Kolkata – 700032

Head

Department of History

Jadavpur University

Kolkata – 700032

Dean

Faculty Council of Arts

Jadavpur University

Kolkata – 700032

# DECLARATION

I do hereby declare that the dissertation titled "বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (১৯০৯-১৯৯৮)" submitted by me in order to fulfill partial requirement for the degree of M.Phil in History at Jadavpur University of the session 2017-2019. My class Roll No. is 001700603006.

This work is original and no part of it has been submitted anywhere else for any other Degree or Diploma.

Date: Abhishek Naskar

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে অধ্যায়নকালে অর্থাৎ ছাত্রজীবনে ইতিহাস বিষয়টির উপর আমার আগ্রহ জন্মায়। এই আগ্রহবশত এবং বিশেষ ভালোলাগা থেকে পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে সুযোগ পেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাই। স্নাতকোত্তর অধ্যায়নকালে ভবিষ্যতে গবেষণা করার যে সুপ্ত বাসনা ছিল তা এম. ফিল এ গবেষণা করার সুযোগ লাভের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র হিসাবে প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল এই মিশনের প্রাণপুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর অবদানকে ইতিহাস চর্চার পাদপ্রদীপে আনতে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তথা সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অসাধারণ অবদান থাকলেও পরবর্তীকালে লোকমানস থেকে তা প্রায় অন্তর্হিত হয়। এই গবেষণা মূলত সেই অন্তর্হিত ইতিহাস চেতনাকে পুনরবলোকন ও পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে পরিচালিত। এই গবেষণায় মূলত বিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর জীবনাদর্শ, উন্নয়নমুখী চেতনা এবং কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল ভাস্বর স্বরূপ কৃতিত্বের প্রতি আলোকপাতের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিগত দু'বছর ধরে গবেষণাপত্রের কাজ পরিচালনা ও সুসম্পন্ন হওয়ার মূলে যাঁর অবদান সর্বাধিক তিনি হলেন আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড: শুভাশিস বিশ্বাস মহাশয়। তাঁর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋনী, গবেষনার ক্ষেত্রে আমার আগ্রহের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুর যথাযথ বিন্যাস ও তার অনুধাবন তথা পরিবেশের প্রতি মুহূর্তে তাঁর নিরলস তত্ত্বাবধান, সহযোগীতা ও পরামর্শ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরন করি। তৎসহ আমি কৃতজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যতম অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার মহাশয়ার বিবিধ মূল্যবান

তথ্যদি ও সুপরামর্শ আমার গবেষণা পত্রটির গুনগত মান বৃদ্ধিতে সর্বদা সহায়ক হয়েছে। সেইকারনে তাঁর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গবেষণা কার্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ সময় ধরে কাজের সূত্রে আমি ব্যবহার করেছি জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগার, নরেন্দ্রপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাগবাজার গ্রন্থাগার, বেলুড় গ্রন্থাগার এইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ও কর্মচারী বন্ধুদের সহায়তায় নিয়মিত গ্রন্থপাঠ, গ্রন্থ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে প্রতিলিপি করতে পেরেছি। এই সুযোগদানের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। 'ধর ব্রাদার্স' আমার গবেষণাটি বাঁধাইয়ের দায়িত্ব গ্রহন করায় আমি তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারীবৃন্দকে। তৎসহ কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত ব্যাক্তি বর্গকে যাঁদের সাক্ষাৎকারে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কিত আমার গবেষণাপত্র আরো তথ্যনিষ্ঠ হতে পেয়েছে।

এই গবেষণাকার্যের অন্তরালে আমার পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। উল্লেখ করি আমার মা শ্রীমতী মমতা নস্কর এবং বাবা শ্রী রজন কান্ত নস্করের নিরলস সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ ও অনুপ্রেরণা কে। এঁদেরকে বাদ দিয়ে আমার জীবন, পঠন-পাঠন ও গবেষণা কোনো কিছুই সহজ গতি লাভ করতে পারত না। আমার পরিবারের সাহায্য, যত্ন, সহানুভূতি, সাহচর্য, আন্তরিকতা এই গবেষণাকার্যকে সম্পূর্ন রূপ দান করেছে। সুতরাং ধন্যবাদ প্রাপকদের তালিকায় এঁদের স্থান সবশেষে হলেও, এঁরা বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্তির দাবি রাখেন।

সমস্ত গবেষণাকার্যে আমার শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তা ও পরামর্শ সর্বদাই লাভ করেছি এবং সর্বান্তকরণে চেষ্ঠা করেছি নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে এই কর্ম প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠু রূপ দিতে। তৎসত্ত্বেও গবেষণাপত্রটি রচনার সময় আমার অজ্ঞতাসারে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

# সূচীপত্র


পৃষ্ঠা

**শংসাপত্র** i

**ঘোষণাপত্র** ii

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার** iii-V

**ভূমিকা** ১ - ১০

**প্রথম অধ্যায়** ১১ - ৩৩

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

**দ্বিতীয় অধ্যায়** ৩৪ - ৬৫

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কর্মজীবন

- নরেন্দ্রপুর ও ব্রহ্মানন্দ প্রতিষ্ঠা
- নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
- নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
- নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি
- নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা

**তৃতীয় অধ্যায়** ৬৬ - ৭৭

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা

- শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে চিন্তাধারা
- শ্রী শ্রী সারদা দেবী সম্পর্কে চিন্তাধারা
- স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চিন্তাধারা

পৃষ্ঠা

**চতুর্থ অধ্যায়** **৭৮ - ১১১**

লোকস্মৃতিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

**উপসংহার** **১১২ -১২০**

**গ্রন্থপঞ্জী** **১২১ - ১২৫**

**চিত্রসূচী** **১২৬ - ১৩২**

- স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর প্রতিচ্ছবি
- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়
- নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়
- নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি
- ব্রহ্মানন্দ ভবন
- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

# ভূমিকা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ও স্বামী বিরাজানন্দজীর ভাবশিষ্য স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর জীবন ও জীবনচর্যা (১৯০৯-১৯৯৮) নিয়ে বর্তমান গবেষণাপত্রটি লেখা হয়েছে। রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম মহান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ওপর ভিত্তি করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নাম স্বামী লোকেশ্বরানন্দের প্রবন্ধগুলিতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। আর সেটাই স্বাভাবিক কারণ ভারতীয় নবজাগরণ-এর ইতিহাসে এঁদের গুরুত্ব অপরিসীম বললে খুবই কম বলা হয়। আজ রামকৃষ্ণ মিশন বহু শতাব্দীর জাতপাতের কুসংস্কার ও বাহ্য অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত সংশোধিত হিন্দুধর্মের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। আধ্যাত্মসাধনার পাশাপাশি তাঁরা দীন-দুঃখীর সেবা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতীয়দের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করার প্রকৃত প্রয়াস করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের নাম আজ আর কোন ও ভারতীয়র কাছে অজানা নয় এবং বহু ভারতীয়, বিশেষত যাঁরা বাঙালি, তাঁদের অনেকেরই স্বামী লোকেশ্বরানন্দ-এর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। লোকেশ্বরানন্দজী কলকাতা মহানগরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ন শিক্ষামূলক 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার' এর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মহান রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই প্রবীন সন্ন্যাসী সুদীর্ঘকাল সঙ্ঘ এবং সেইসাথে সমগ্র মানবস মাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। আধুনিক সুসংস্কৃত হিন্দুধর্মের নৈতিক চিন্তাভাবনাগুলি খুব সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাবে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বণর্না করেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখি মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে যখন সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে। ভুলে যায় কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটা প্রেয় কোনটা অপ্রেয়। শাশ্বত যেসব মূল্যবোধ সেগুলো মানুষ হারিয়ে ফেলে। সত্যের শক্তিতে, ধর্মের শক্তিতে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। একটা আত্মবিস্তৃতি এসে মানব সমাজকে গ্রাস করে এরকম যখন হয়, মানুষ নিজের শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তখন ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন মানুষ হয়ে, মানুষকে পথ দেখাতে। আমাদের মতো তিনি চলেন ফেরেন, আমাদের মতো শোক-তাপ, ব্যাধি যন্ত্রনা সহ্য করেন। আপাত দৃষ্টিতে সবকিছু তাঁদের সাধারন মানুষের মতো। কিন্তু তবুও সবকিছুর মধ্যেও থাকে অসাধারনত্বের ছাপ। তাঁদের সবকিছুই লৌকিক, আবার তাঁর মধ্যেও অনেক কিছু থাকে যা মনে হবে অলৌকিক। কেন তাঁরা মানুষের  শরীর নিয়ে এসে সাধারন মানুষের মতো আচরন করেন? কারন তা নাহলে আমরা তো তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। অবতারের মতোই তাঁরা মানুষের কাছে সেরকম একটু নরম ভাব ধরে আসেন। আমাদের সকলের মধ্যে আমাদের মতো করেই তাঁরা থাকেন  আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না কে  তিনি, কি তাঁর স্বরূপ। তারপর হঠাৎ এক দেন চলে যান, তখন আমরা চমকে উঠি। হঠাৎই যেন আবিষ্কার করি, তিনি আমাদের এমন কিছু মূল্যবান সম্পদ দিয়ে গেছেন যা আমরা হারিয়েছিলাম অথবা যা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন এমনই এক মহান ব্যক্তি। তিনি বিশেষ একটা সম্প্রদায় গড়েন নি। সমস্ত মানব জাতিকেই, সব মতের, সব ভাবের, সব পথের মানুষেই যেন পরম ভালবেসে নিয়ে যাচ্ছেন শাশ্বত সত্যের দিকে। সকলের মধ্যেই যে দেবত্ব আছে সে দেবত্ব বিকাশের পথকে  তিনি সুগম করে দিচ্ছেন। আবার পথ একটা নয়, ভাব, রুচি, জ্ঞান, বুদ্ধি অনুসারে যেটা যারা নিতে পারে তাকে তিনি তাই দিচ্ছেন। তাঁর মধ্যে

কোনো সংকীর্ণতা নেই। তিনি কোন বিশেষ দেশ বা কালের জন্য আসেননি। এটা বিজ্ঞানের যুগ। এযুগে মানুষ সব এক হয়ে গেছে। মানুষ আগের মতো আজ আর সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে নিজেদের আটকে রাখতে চায় না। লোকেশ্বরানন্দজী সেই পরম ঐক্য, সেই এককে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। প্রেম-ভক্তি দিয়েই হোক, ত্যাগ-তপস্যা করেই হোক, যোগ সাধন করেই হোক আবার গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেই হোক, তোমার রুচি; তোমার সামর্থ্য অনুসারে তুমি এগিয়ে চল। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে এক অনন্ত পথের দিশারা আছে। যে করেই হোক অপূর্ণতা থেকে আমাদের পূর্নত্ব লাভ করতে হবে। এই উদারনৈতিক, সার্বজনীনতার জন্যই সকলে লকেশ্বরানন্দজীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তিনি বিশেষ জোরের সাথেই বলেছেন তোমার যা ভাল লাগে, তোমার যা ভাব, সেই ভাবে সেই পথে তুমি এগোও। এমন নয় যে মূর্তিপূজা করতেই হবে। এই মন্ত্র উচ্চারন করতেই হবে বা সংসার ত্যাগ করতেই হবে। তিনি প্রচার করেছেন ঈশ্বর অনুরাগ, সত্যের প্রতি অনুরাগ।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহাকায় মানুষ ছিলেন। তাঁর শরীরে এবং মনে নানাবিধ বিশালতার  সমাহার ঘটেছিল। আকারের ও আয়ুর বিপুলতার সঙ্গে মনের গভীরতার ও চরিত্রের বিস্তৃতির এমন মেলবন্ধন আধুনিক কালে খুবই কম দেখা যায়। মহাপুরুষ ব্যক্তি যদি একই সঙ্গে দীর্ঘজীবী, অনিন্দ্যকান্তি এবং বিপুলাকার হন। তবে নিকটজনের পক্ষে বিষম বিপদ ঘটে। অলিম্পিয়া পর্বতে বা হৃষীকেশ-হরিদ্বারে যে দিব্যপুরুষদের বিচরন ছিল, তাঁদের স্মৃতি জাগরুক হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ভক্তি বিপজ্জনক। মহান্ মানুষকে তাঁর ইতিহাসের পরিপেক্ষিতে ফেলে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানোর পথ এতে খানিকটা অবরুদ্ধ হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী হাজার হাজার ছাত্রের কাছে মহীরূহস্বরূপ ছিলেন। তাঁর ঔদার্য, কল্পনা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং ঐন্দ্রজালিক

ব্যক্তিত্বের প্রভাব এই ছাত্রদের পক্ষে প্রবল। অন্য আরও হাজার হাজার মানুষ তাঁকে দেখেছেন ভাষ্যকর, ব্যাখ্যাতা এবং গুরুপ্রতিম প্রচারক হিসাবে। এই ভূমিকায় তিনি অসাধারন পন্ডিত, অতুলনীয় বাগ্মী। এমতাবস্থায় লোকেশ্বরানন্দের ব্যক্তিত্বের হীরকদ্যুতি সমকালীন সমাজকে যে বিহ্বল করবে, এতে বিস্ময়ের কোন কারন নেই। কিন্তু যেখানে তিনি সাময়িকতাকে ছাড়িয়ে ইতিহাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে  উপস্থিত। সেখানে তাঁকে এইসব নিকট ভূমিকা থেকে বিচ্যুত করে দেখতে হবে। কিন্তু যে কথাটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা হল, "আমরা অনেকে তাঁকে একটু কাছ থেকেই ধরার চেষ্টা করেছি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু আমরা একদিন চলে যাব এবং সেদিন অনেকেরই মনে পড়বে না তাঁর অনিন্দ্যকান্তি  ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাবের কথা। কিন্তু সেদিনও ইতিহাস থাকবে এবং সেই ইতিহাসে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ থেকে যাবেন। তাঁর চেহারা, কথা বলা, পান্ডিত্য, বাগ্মীতা,সম্মোহন প্রভৃতিকে ছাড়িয়ে তিনি সেখানে ইতিহাসের নিগূঢ় কিছু প্রয়োজনকে মিটিয়েছেন, সেখানেই তিনি অমরত্বের অংশভাক্।

আমি আমার সন্দর্ভপত্রটিতে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর অবদান অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। ইতিপূর্বে লোকেশ্বরানন্দজীকে নিয়ে কিছু লেখালেখি হলেও একবিংশ শতাব্দীতে ও এর পূর্বে কোনো গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ হয়নি। তাই স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর অবদানকে ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মূলত বর্তমান সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে আমি পাঠক মহলের সম্মুখে প্রস্ফুটিত করতে সচেষ্ট যে, কীভাবে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী তাঁর অসাধারন অবদান রেখে গেছেন।

**‘বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী (১৯০৯-১৯৯৮)’** শীর্ষক গবেষণামূলক সন্দর্ভপত্রটিতে আমি আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে শিক্ষার বিস্তার ও গ্রামীন উন্নয়নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর অবদান অনুসন্ধানের মাধ্যমের একটি সামাজিক ইতিহাস পুর্নগঠনে মনোনিবেশ করেছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমি আমার সন্দর্ভপত্রটিকে **‘ভূমিকা’** ও **‘উপসংহার’** ব্যতীত আরো চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি যথা- **‘স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী’** নামাঙ্কিত প্রথম অধ্যায়ে, লোকেশ্বরানন্দজীর জন্ম থেকে সূচনা করে তাঁর জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। যেখানে রয়েছে তার বাল্যকালের ইতিহাস। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সাধারন এক মানুষ থেকে সন্ন্যাসী জীবনে প্রবেশের এক ইতিহাস। লোকেশ্বরানন্দ যখন জন্মগ্রহন করেন। বাংলাদেশে তখন চূড়ান্ত অস্থিরতা। নবজাগরনের যে মধ্যাহ্ন সূর্য গোটা উনিশ শতক জুড়ে আলো দিয়েছিল, তা তখন অবসানের পথে। বিকেলের মরা আলোয় তখনও তাপসঞ্চার ঘটে, কিন্তু বাঙালীর গৌরবের সময় তত দিনে শেষ হতে চলেছে। রাজধানী দিল্লীতে গেল, প্রথম মহাযুদ্ধের দারুন আক্রমন, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অভ্যুদয়, সব মিলিয়ে জাতীয় স্তরে বাংলাদেশ ক্রমেই প্রান্তিক অবস্থানে পিছু হটছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত যুবসমাজ তীব্র তিক্ততায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নিল। সে কাহিনী যেমন বিপুল ব্যক্তিগত বীরত্বের, তেমনি আত্মহননেরও বটে। লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ভিতর থেকে এই রাজনীতির চেহারা দেখেছিলেন। দেশ গড়ার স্বপ্নে নৈরাজ্যের বিপ্লবী কারিগরির পথেই তাঁর প্রথম দীক্ষা। ধরে নিতে পারি, এই পর্বে তিনি কিছুটা সাহসী, কিছুটা ত্যাগী, কিছুটা দিকভ্রষ্ট, কিছুটা চিন্তিত এবং অবশ্যই অনেকটা পথের সন্ধানী। এই দ্বিধা ভারতীয় বা বঙ্গীয় রাজনীতিতে কুড়ি–তিরিশ-চল্লিশের দশকে বেশ কয়েকটি বিভিন্নমুখী ধারার জন্ম হয়েছিল। এই সময় কেউ কেউ মার্কসবাদী সাম্যের পথ

নিয়ে শ্রমিক কৃষকের দল গঠনে ব্রতী হন। অন্য কেউ কেউ মার্কসবাদকে অবলম্বন না করে বিপ্লবী সমাজবাদের কথা বলে। যুগান্তর-অনুশীলনের পথ বেয়ে এভাবেই বাংলাদেশে নানা ধরার বামপন্থী রাজনীতির সূচনা ঘটে। ঈষৎ দূরে দাঁড়িয়ে অন্য কেউ কেউ অরেকটু ঐতিহ্যাশ্রিত পথের সন্ধান করেন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে বিকল্প ইস্তাহারের সন্ধান পান। পিছনে বিপ্লবী রাজনীতির পটভূমিকা, মনে দেশ গঠনের তীব্র আর্তি, আত্মত্যাগ বিষয়ে সম্পূর্ন দ্বিধাহীনতা এবং পরিজন প্রতিবেশের গন্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রয়োজনে নিজেকে যুক্ত করা–এই ছিল তৎকালীন অগ্রসর দেশভক্ত বঙ্গীয় যুবসমাজের মানসিক প্রতিচ্ছবি। কেবল পথের বিচারে কেউ নিলেন মার্কস লেনিনের রাস্তা, কেউ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পথ আবার অন্য কেউ গেলেন ভারত সেবাশ্রমে। বাঙালী যুবসমাজের এই অংশটির চিন্তা ও কার্যকালাপ যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে আরও কয়েকটি তথ্য বেরিয়ে পড়বে। বিপ্লবী ঐতিহ্যের স্মরনে এবং আগামী দিনের কাজের প্রয়োজনে প্রবল জোর পড়ল শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের  উপর। ব্যক্তিগত অভিরুচি নয়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন ও বিধিবদ্ধ তাকেই অনুসরনীয় বলে জ্ঞান করা হল। কাব্য-কামিনী-কাঞ্চন স্পৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের পৃথিবীকে দূরে সরিয়ে নিবিষ্ট সাধনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জগৎকেই বেছে নিলেন এই যুবকেরা। স্বাধীনতা এল দেশভাগকে সঙ্গে নিয়ে, ছিন্নমূল, বাস্তুচ্যুত পূর্ববঙ্গীয় সমাজ এবার সম্পূর্ন নোঙরহীন এবং ফলত প্রচন্ড তীব্র। জমির বন্ধন নেই, নতুন দেশে নতুনভাবে ঘর বাঁধার এবং নতুনভাবে সামাজিক বিন্যাসগুলি সাজিয়ে নেওয়ার আকৃতি যূথবদ্ধ কাঠামো চাইল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনুরূপ পরিস্তিতিতে ধর্মভিত্তিক উগ্র হিন্দু রাজনীতির সূচনা হয়েছিল, কিন্তু রেনেসাঁস আধুনিকতা বিপ্লবে দীক্ষিত বঙ্গসমাজকে সে পথ পরিহার করতে হল। শক্তিশালী হল বামপন্থী আন্দোলন, বিভক্ত স্বাধীন স্বদেশকে নতুনভাবে সাজানোর উচ্চকণ্ঠ প্রয়াস। পাশাপাশি কিন্তু একই

সমাজ এবং একই শ্রেনীর অন্য কেউ কেউ একই স্বপ্ন নিয়ে অন্য এক ইস্তাহার রচনা করলেন। সে ইস্তাহারে মার্কস-লেনিন বামপন্থার পরিবর্তে এল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন, জমির লড়াইয়ের বদলে জায়গা পেল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়ার প্রয়াস। একই পরিপ্রেক্ষিত, একই ইতিহাস, একই ছিন্নমূল শরণার্থী তীব্রতা, শুধু পন্থার ভিন্নতা, ওঁরা বললেন রাজনীতি, এঁরা বললেন সমাজ, ওঁরা চাইলেন রাষ্ট্রদল, এঁরা চাইলেন ম্যানমেকিং এডুকেশন, ওঁরা ছাড়িয়ে দিলেন পার্টিকে, এঁরা তৈরি করলেন একের পর এক আশ্রম ও শিক্ষা কেন্দ্র। আর্ত মানুষকে ওঁরা সামিল করলেন মিছিলে, এঁরা নিয়ে এলেন ছাত্রাবাসে। দুপক্ষই প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করলেন,প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ ও শৃঙ্খলার বুনিয়াদকে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার উর্ধ্বে স্থাপন করলেন,সকলের মুক্তিকে ব্যক্তির উন্নতির চেয়ে মূল্যবান বলে মেনে নিলেন। দুপক্ষই কমবেশি উচ্চবর্গীয় দ্বিধার শিকার। আবার দুপক্ষই আদর্শগত স্তরে বারবার সকল দ্বিধা অতিক্রম করে সমাজের সর্বশ্রেনীর মানুষের কাছে নেমে আসতে প্রয়াসী।

**‘স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কর্মজীবন’,** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোকেশ্বরানন্দজীর শিক্ষামূলক ও গ্রামীন উন্নয়ন মূলক কর্মজীবনের বিস্তারিত বিবরনী দেওয়ার চেষ্টা করেছি। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকে এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। তাঁর কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কাল হল চল্লিশের শেষ দিক থেকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক। একদিকে দেশ ভেঙে গিয়েছে। অন্যদিকে নতুন দেশ গড়ে উঠেছে। সীমান্ত পেরিয়ে বিপুল উদ্বাস্তু জনস্রোত আসছে। বাঙালী জীবনের সবচেয়ে সংকটের সময়। পিছনে নবজাগরণ স্বদেশী বিপ্লবী কর্মকান্ডের গৌরবময় পরিপ্রেক্ষিত। সমাজকে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। কেউ শ্রমিক বিপ্লবের কথা ভাবছেন, কেউ বৈরাগ্যের । এই সময় যে ধারাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে ঐতিহ্যাশ্রিত জাতিগঠনের প্রয়াসী

হয়েছিল,লোকেশ্বরানন্দ সেই ধারার অন্যতম প্রধান নেতা ও অগ্রনী পুরুষ। সমকালীন তীব্র রাজনীতির বিপরীতে নিঃশব্দে পাথুরিয়াঘাটায় ও নরেন্দ্রপুরে বসে তিনি এক বিকল্প ইস্তাহার রূপায়ন করেছিলেন। সাল ১৯৪৩, বড়ো দুর্দিন তখন ভারত তথা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে সাথে মানুষের  অবর্ণনীয় দুর্দশা, সঙ্গে যুক্ত হল পঞ্চাশের (বাংলা ১৩৫০, ইংরাজী ১৯৪৩) মারণ মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলার দশ লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রান চলে গেল। এই মহাদুর্দিনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ দানের জন্যই মুখ্যত ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার কথা মিশন কর্তৃপক্ষের মনে এল। তাছাড়া ১৯৪৩ এর মহাদুর্ভিক্ষ কবলিত দুঃস্থ। মেধাবী ছাত্ররা যাতে বিনা ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সে সদিচ্ছাও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার মূলে। সর্বপরি ‘চারিত্রদুর্ভিক্ষ’ দূর করাও ছিল অন্যতম আরেক উদ্দেশ্য। ১৯৪৩ সালের ৭ই মে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সূচনা হল পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের। সদ্যোজাত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম কয়েকটি বছর মোটেই শান্তিতে কাটেনি। স্বামী প্রনবেশানন্দজির সময়ই কিছু ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরনে আশ্রমের সংকট ঘনিয়ে এল। বেলুড়মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসটি বন্ধ করে দেওয়ার কথা পর্যন্ত ভেবেছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে এই দুর্যোগের দিনে হাল ধরলেন স্বামী লোকেস্বরানন্দজী মহারাজ। তিনি ১৯৪৬ সালে জুন মাসে চতুর্থ অধ্যক্ষ হিসাবে পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহন করলেন এবং ধীরে ধীরে দুর্যোগ কেটে গেল। পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বিখ্যাত শ্বাশ্বত সাধনায় পবিত্র পাঠভূমি নরেন্দ্রপুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লোকেশ্বরানন্দজীর চেষ্টায় নতুন ভাবে যাত্রা শুরু হল। অনুশাসিত, শিক্ষাশ্রেয়ী, ঐতিহ্যাভিমানী সেই বিকল্প কর্মসূচী কালানুক্রমে এক বিপুল চেহারা পেয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতি অভিমানী তীব্রতায় একদিকে বামপন্থাকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে অনুকূল অনুরাগে শক্তিশালী করেছে

সমাজ গঠনের বিকল্প শিক্ষাশ্রয়ী পথকেও। ঐতিহাসিক বিবর্তনে দুই ইস্তাহারই বহু হোঁচট খেয়েছে। আবার বেশকিছু সাফল্যও পেয়েছে। দুই পথেরই পথিকৃৎ পুরুষেরা আজ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত। একই ইতিহাস তার দুই হাতে দুই পক্ষকে নির্মান ও লালন করেছে। এই পক্ষেরই বহু সাফল্য এবং ব্যর্থতা আছে কিন্তু সেইসব সাফল্য ও ব্যর্থতাই হল ইতিহাস। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং তাঁর সহকর্মীদের এই বিপুল ঐতিহাসিক পরপ্রেক্ষিতে দেখলে তাঁদের তৎকালীন কর্মকান্ডের প্রকৃত দীর্ঘ মেয়াদী তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হয়।

**'স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা'** নামাঙ্কিত তৃতীয় অধ্যায়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন তথা বিশ্বের প্রতিটি রামকৃষ্ণ মিশন যে তিনটি মুখ্য প্রতীকী আর্দশ যথা- শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকাকনন্দকে মেনে চলে, তাঁদেরকে নিয়ে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ভাবনাকে পাঠক মহলের নিকট প্রস্ফুটিত করতে সচেষ্ট হয়েছি। **'লোকস্মৃতিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী'** শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়টিতে, প্রধানত আমি আমার সমস্ত সাক্ষাৎকারগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমি দেখাতে চেয়েছি কীভাবে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী তাঁর সহকর্মীদের (শিক্ষক, অধ্যাপক, সন্ন্যাসী) সাথে শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি ত্রান কার্যেও এক অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তৎসহ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর চিন্তাভাবনা বর্তমান সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি পূর্বোক্ত চারটি অধ্যায়ের বিশ্লেষনাত্মক পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে **'উপসংহারে'** একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করেছি যে, বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর অবদান অনুসন্ধান ভারতীয় ইতিহাসচ চর্চার ধারার এক নবতর সংযোজন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সন্দর্ভপত্রটির মূল বিষয়বস্তু গুলি পাঠকবর্গের নিকট যথাসম্ভব উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমি সহজবোধ্য ভাষা প্রয়োগ করে, পাঠক মহলের নিকট বোধগম্য বিবরন প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান সন্দর্ভপত্রটিকে একটি তথ্যনিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ গবেষণাপত্র রূপে উপস্থাপন করতে অভিলাষী হয়েছি।

# প্রথম অধ্যায়

# স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের জন্ম পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কেঁড়াগাছি গ্রামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে এপ্রিল। এখানেই শ্রীচৈতন্যপার্ষদ হরিদাসের জন্ম হয়েছিল। কেঁড়াগাছি ছিল লোকেশ্বরানন্দের মামাবাড়ি। পিতৃপুরুষের বাসস্থান ছিল বারুইপাড়ায়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের মায়ের নাম শিখরবাসিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবার নাম বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসার ত্যাগের আগে লোকেশ্বরানন্দের নাম ছিল শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম ছিল কানাই। কানাইরা চার ভাই ও দুই বোন। এক ভাই ও এক বোনের পরই কানাই। ছোট ভাই – বোনরা তাঁকে 'মেজদা' বলে ডাকত। পাড়ার সকলেরও তিনি ছিলেন মেজদা। কানাই যখন দু-এক বছরের শিশু, তখন হঠাৎই তাদের কেঁড়াগাছির বাড়িতে এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর আর্বিভাব হয়। শিখরবাসিনী তখন ছোট্ট শিশুটিকে কোলে ফেলে তেল মাখাচ্ছিলেন। সন্ন্যাসী  শিখরবাসিনীকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলেটিকে একটু ভালো করে দেখাও তো মা"। ভালো করে দেখে সন্ন্যাসী বলেছিলেন , "এই ছেলেটিকে খুব যত্ন কোরো, এ যদি বেঁচে থাকে তবে নাম রেখে যাবে।" সম্ভবত সেই সময় থেকেই শিখরবাসিনীর ধারনা হয়েছিল যে, তাঁর এই ছেলে ঘরে থাকবে না। আমরা পরে দেখব , এই মহীয়সী মহিলা পুত্রের মহান জীবনব্রতে বাধা দেওয়া তো দূরে থাক, প্রান খুলে আর্শীবাদ করেছিলেন। শিখরবাসিনী ছিলেন তাঁর মা-বাবার একমাএ সন্তান। তাই কানাই এর কাছে মামাবাড়িও ছিল তাঁর নিজের বাড়ির মতো। তাঁর বেশি টান ছিল কেঁড়াগাছির প্রতিই। ছোট্ট শিশুর নানারকম দেবদর্শন হত বলে শোনা যায়। আত্মীয় ও

প্রতিবেশিনী যারা সব পাশে থাকত। তাদের উদ্দ্যেশ্যে মাঝে মাঝে সে বলে উঠতঃ 'ঐ দেখ কালী এসেছে, কৃষ্ণ এসেছে, শিব এসেছে' পরবর্তী জীবনে কানাই অবশ্য তাঁর এইসব দর্শনের কথা মনে করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীরা এর সাক্ষ্য দিতেন।

ছোটবেলা থেকেই কানাই সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ও প্রানচাঞ্চল্যে ভরপুর। গ্রামের সকলেরি সে প্রিয়। তাঁর মার্জিত ব্যবহার, সততা ও নীতিপরায়নতার জন্য সকলেই তাঁকে যেমন ভালবাসত, তেমনি সমীহ করে চলত। কানাই এর মধ্যে বালকসুলভ চাপল্য বেশি ছিল না। কিন্তু একগুঁয়ে ছিল। যা সে করবে বলে ঠিক করেছে, তার অন্যথা করানো খুব কঠিন হত। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বলে নেওয়া প্রয়োজন বারুইপাড়ার নিকটবর্তী সোনাবেঁড়েতে ছিল রানী রাসমনির জামাতা মথুরবাবুর পৈতৃক ভিটে। মথুরবাবুর গুরুগৃহ ছিল তালাগ্রামে। একসময় বিষয়-সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে মথুরবাবুর গুরুবংশীয়দের মধ্যের বিবাদ মেটানোর জন্য মথুরবাবু তালাগ্রামে এসেছিলেন বারুইপাড়ার মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়। ঠাকুর তাঁর গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছেন একথা ভেবে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সবসময় রোমাঞ্চ অনুভব করতেন। একটি অন্তরঙ্গ সভায় স্মৃতিচারনা করতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন, "এ হয়তো আমার স্পর্ধা হয়ে যাচ্ছে, তবু বলছি – আমি ভাবি , তিনি বোধহয় আমাকেই খুঁজছিলেন। যেন আমাকে ডেকে বলছেনঃ আয় আয় আমার কাছে চলে আয়"। নিজের বাড়ি ছেড়ে কেন পরের বাড়িতে আছিস ? নিজের বাড়িতে চলে আয়। বাস্তবিকই তালাগ্রামে জনশ্রুতি ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই গ্রামের বেলতলায় বসে গান গাইতেন।

লোকেশ্বরানন্দজীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল – তার ঘুম খুব কম ছিল। সাধারনত তপ্ত দুপুরে বাড়ির সকলে যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করত। কানাই তখন একা একা মনোযোগ দিয়ে

পড়াশোনা করত। কেঁড়াগাছিতে ভালো স্কুল ছিল না। তাই কানাইকে পড়তে যেতে হত হাকিমপুরে। ফোর পর্যন্ত হাকিমপুরে পড়ে তিনি বাবার গ্রাম তালমাগুরোতে এসে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশুনা করেন বি. দে. ইনস্টিটিউশনে। প্রতি ক্লাসে তিনি প্রথম হতেন।

ছোটবেলা থেকেই কানাই খেলাধুলা খুব ভালোবাসত এবং ভালো খেলতও। আর পশুপক্ষীর প্রতি আজন্ম প্রেম তার। একবার একটা সাদা শুয়োর কানাই এর ঘরে এসে শুয়েছিল কিন্তু ক্যাওরা রা হয়তো সেটিকে চুরি করে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। তা শুনে কানাইয়ের চোখে জল আর থামে না। আরেকটি ঘটনা, কানাই ব্রহ্মচারী হওয়ার পর একদিন বাড়ী গেছেন তাঁর ছোট ভাই কেষ্ট কানাই এর জন্য দুটি পায়রা খাটের নিচে রেখেছিলেন কিন্তু কানাই তাদের বুকে তুলে নিয়ে আকাশে উড়িয়ে দেন। ছোটবেলায় কানাই এর মন এত কোমল ছিল যে, ক্লাসে শিক্ষক অন্য কোন ছাএকে প্রহার করলে তার নিজের চোখ থেকে জল পড়ত। একটু বড়ো হয়ে কানাই অবশ্য এই অতি সংবেদনশীলতা দূর করতে পেরেছিলেন। প্রয়োজনে ও কর্তব্যের খাতিরে তিনি কঠোর হতে পারতেন। ছোটো ভাইবোনেরা পড়াশুনা না করলে তিনি তাদের প্রহার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। একবার কানাই যখন অসুস্থ, প্রতিবেশী একটি মেয়ে তাঁর খোঁজ নিতে এসে সহানুভূতির ছলে সে তাঁর সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘনিষ্ট হতে চাইছে। বিরক্ত হয়ে কানাই মেয়েটিকে একটি চড় কষিয়ে দেয়। আর কখনো ঐ মেয়েটি ভুল করেনি। কানাই ছোটোবেলা থেকেই ছিল কঠোর নীতিপরায়ণ। কানাই অষ্টম বা নবম শ্রেণীতে একবার পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন পারছিলেন না কিন্তু অন্য বন্ধুদের কাছে শুনতে পেয়েও তিনি উওরটা লেখেননি।

কেঁড়াগাছি কানাই-এর মনপ্রান আচ্ছন্ন করে রাখত। যবন হরিদাসের জন্মদিন উপলক্ষে মেলা তো বটেই এছাড়া কেড়াঁগাছির সবচেয়ে বড় আকর্ষন ছিল সেখানকার রামমন্দির।

বহুদিনের পুরানো রামমন্দির। কাঠের তৈরী রাম, সীতা, লক্ষ্মন, ও মহাবীরের মূর্তি সবাইকে আকর্ষন করত। তারা বিশ্বাস করত, মন্দিরের সব বিগ্রহই বড় জাগ্রত। কানাই সংসার ত্যাগের আগে শেষবার যখন কেড়াঁগাছিতে যান তখন রামচন্দ্রকে জানিয়ে, মনে মনে তাঁর অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেশবিভাগের পর এই রামমন্দির উঠে এসেছে মস্‌লন্দপুরে। তারপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই লোকেশ্বরানন্দজী ঐ রামমন্দির দর্শনে যেতেন। দেহত্যাগের দু-সপ্তাহ আগেও (১৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮) বহু ভক্তসহ মস্‌লন্দপুরে গিয়ে রামচন্দ্রকে প্রণাম করে এসেছিলেন। কানাইয়ের মা-বাবা দুজনেই ছিলেন উদার ও হৃদয়বান মানুষ। পরবর্তীকালে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের মধ্যে যে অসাধারন উদারতা ও হৃদয়বত্তা দেখা গেছে, তা অনেকটাই মা-বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। লোকেশ্বরানন্দজীর নিজের কথায়ঃ বারুইপাড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম ছিল। ছোটবেলা মামাবাড়ী কেড়াঁগাছি বেশ প্রাচুর্যের সাথেই কেটেছে – পুকুরে, বাগান। আদুরে ছেলে ছিলাম। বাড়ীর বাইরেও , সবাই ভাবত, ও আলাদা। ও কোনো অন্যায় করবে না। যখন ১০ থেকে ১২ বছর বয়স , তখনই নেতা ছিলাম। বড় হয়ে মিটিং করতে গিয়ে পুলিশের মারও খেয়েছি। গান্ধিজীর লবন আন্দলনে পুলিশের লাঠি খেয়েছি। কেড়াঁগাছিতে আমার ছোটোবেলা কেটেছে রামচন্দ্রকে ঘিরে। ভোরবেলা কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজে ঘুম ভাঙত। তারপর বালভোগ, দুপুরে খাওয়ানো, শয়ন, সন্ধ্যারতি। এইভাবেই রামচন্দ্রের সঙ্গে গোটা দিন কাটত। ছোটবেলায় রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন প্রথম হই আর ভালো সাধু হতে পারি। রামচন্দ্রকে চিঠিও লিখতাম। রামনবমীতে মেলা বসত। মা-ই মেলাটাকে সংগঠিত করতেন। রামচন্দ্রের মন্দিরের সামনের মাঠেই। গ্রামের লোকেরা সেই মেলায় অংশ নিত। শেষবার যখন কেড়াঁগাছি যাই সাধু হওয়ার আগে, রামচন্দ্রের সাথে দেখা করে আসি। শিকল খুলে মন্দিরে

ঢুকে রামচন্দ্রেকে বলে এলাম, ঠিক ঠিক যদি সাধু হতে পারি তবে জানব তুমি আছ , নয় বুঝব সব মিথ্যা। সেই রামচন্দ্র এখন মস্‌লন্দপুরে, বড়ো ভালো লাগে দেখতে।

জাতপাতের বিধিনিষেধ ছোটবেলা থেকেই কানাই এর ভালো লাগত না। ছোটবেলায় বাধ্য হয়ে মানতে হলেও বড় হয়ে জোর করে সেগুলি ভাঙতেন এবং ভেঙে আনন্দ পেতেন। ফুটবল খেলে জল খেতে যেতেন তথাকথিত নিচু জাতিদের বাড়ি। বয়স্করা দেখে ফেললে ভয় দেখাত বাড়ীতে বলে দেবে বলে। কানাই কিন্তু সেসব গ্রাহ্য করতেন না। কানাই বেশী ঘনিষ্ট ছিল মায়ের সঙ্গে। মায়ের প্রভাবই তার জীবনে বেশী পড়েছিল। শৈশবে গর্ভধারিনী এবং পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষক শ্রীশচন্দ্র সান্যাল – এই উভয়ের প্রভাবেই কানাই সন্ন্যাসজীবন গ্রহন করতে সমর্থ হয়। এছাড়া তার জন্মগত শুভসংস্কার তো ছিলই। কানাই এর মাতৃকুল ছিল শক্তি উপাসক। যদিও শিব ও নারায়নের উপাসনাও তাদের বাড়িতে হত। মায়ের কাছ থেকেই একেবারে শিশু অবস্থা থেকেই পুরান ও ধর্মগ্রন্থের অনেক কাহিনী কানাই শুনতেন, মা তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুই ভালো করে ভাগবত আর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুটো ভালো করে পড়িস। লোকেশ্বরানন্দজীর খুব আক্ষেপ ছিল যে, ভাগবতটা তাঁর ভালো করে পড়া হয়ে ওঠেনি। শিখরবাসিনী দেহত্যাগ করেন ৫০-৬০ বছরে। তখন কানাই ব্রহ্মচারী। মৃত্যুর কিছুদিন আগে কানাই তাঁকে দেখেতে গেছিলেন। মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘মা, তোমার ভয় করছে ?’ শিখরবাসিনী উওর দিয়েছিলেনঃ ‘কিসের ভয়? যদি যেতে হয় যাব, তোদের সবাইকে ফেলে চলে যাব’।

কানাই তার গ্রামের স্কুল বি.দে. ইনস্টিটিউশনে পড়েছে ক্লাস পঞ্চম থেকে নবম পর্যন্ত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে রংপুর থেকে। পরবর্তী পড়াশুনা করেছে কলকাতা থেকে। ছাত্রাবস্থাতেই গ্রামের লোকেরা সুখেদুঃখে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলত। গ্রামের কারোর অসুখ-

বিসুখ হলে অন্য ছেলেদের নিয়ে তাদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। গ্রামে একবার কলেরার রোগীর সেবায় নিজে সহ কয়েকজন কোমরে গামছা বেঁধে সেবাব্রতে নেমেছিলেন। কানাই- এর নেতৃত্বশক্তি ও ব্যক্তিত্ব ছোটবেলা থেকেই এত প্রকট ছিল যে, বাড়ীতে তার বাবা এবং বড়রাও তার মতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।[১]

কানাই যখন কলকাতায় আই.এ পড়ে ,স্বদেশি আন্দোলনের যুগ। গ্রামে এসে কানাই ঘোষনা করল যে, আজ থেকে কেউ বিলিতি চিনি খাবে না। সেদিনই গ্রামে দু-বাড়িতে পৈতে ছিল। বয়স্করা অনেক করে কানাই কে অনুনয় করল আজ দিনটার জন্য। কানাই শুনল বটে কিন্তু নিজে সেই খাবারে মুখও দিল না। একবার গ্রামে একটি ছেলে তার মাকে মেরেছিল কানাই তার কাছে যাওয়াতে সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। এমনিই ছিল কানাই এর ব্যক্তিত্ব।

কানাই–এর জীবনের সন্ধিক্ষন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। কানাই গ্রামের স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে, দশম শ্রেণীতে উঠবে। তাঁর এক কাকা তাঁকে নিজের বাসস্থানের কাছে লালমনির হাট স্কুলে নিয়ে যান। যে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন শ্রীশচন্দ্র সান্যাল। প্রথম দিন স্যার তাকে 'Newspaper' এর উপর একটি essay লিখতে বলেন এবং সেই লেখাটি সান্যাল স্যারের খুব পচ্ছন্দ হয়। প্রথম দর্শনেই কানাই-এর খুব ভালো লেগেছিল হেডমাস্টার মশাইকে। পরদিন অর্থাৎ সোমবার হেডমাস্টারমশাই তাকে একটা আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে বললেনঃ 'দেখি তোমার বুকটা, বুক দেখে তিনি বললেনঃ 'বাঃ , বেশ লক্ষন। তুমি সাধু হবে বাবা, বড় সাধু হবে বাবা'। তার মনের একান্ত ইচ্ছাকে হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখের আর্শীবাদ হয়ে উঠতে দেখে কানাই একইসঙ্গে বিঘ্নিত ও পুলকিত। হেডমাস্টারমশাইয়ের প্রতি তার টান উত্তরোওর বেড়েই চলে। কানাই জানতে পারে হেডমাস্টারমশাই, তাঁর মা ও স্ত্রী – তিনজনেই শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর দীক্ষিত। তাঁর দুই মামা ও

দুই জ্ঞাতিভাই বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী। নিত্য তিনি কানাইকে তাঁর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যেতেন এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কথা বলতেন, আর সাধু হতে প্রেরনা দিতেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে কানাই এক অন্য জগতে চলে যেত। সময়ের খেয়াল থাকত না। ঘন্টার পর ঘন্টা শুনে যেত, কারোরই ক্লান্তি নেই। কখনো কখনো বই পড়তে দিতেন। তাও পড়তেন ঘন্টার পর ঘন্টা। ধ্যানজপ করতে বলতেন। বাড়িতে গিয়ে কানাই যতক্ষন পারতেন ধ্যান জপ করতেন। একটা আবেশে সময়ের পর সময় কেটে যেত। ঠাকুর-মা-স্বামীজী ছাড়াও প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে বলতেন ঠাকুরের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের কথা। রাজা মহারাজ স্বামী (স্বামী প্রভানন্দ), বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রমানন্দ) ও মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ)- এনাদের কথা। হেডমাস্টারমশাই তাঁকে বলেছিলেনঃ 'মহাপুরুষ মহারাজ মঠে বিরাজ করছেন। এই বেলা গিয়ে তাঁকে ধর। তাঁর কৃপা ভিক্ষা কর'। প্রায় তখন থেকেই বলা যায় কানাই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে গুরুপদে বরন করে নিয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে একবছর কেটে গেলো। প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল, কানাই সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। এরজন্য স্কুল থেকে তিনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। যাইহোক, পরীক্ষার পর কানাই ঠিক করল কলকাতা হয়ে সে দেশে ফিরবে। কিন্তু তার আগে বেলুড়মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে দেখে যাওয়ার ইচ্ছে। কলকাতার খিদিরপুরে দাদার কাছে এসে, দু-একদিন থাকার পর সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন মঠের উদ্দেশ্যে। কলকাতায় সাইকেল চড়ার কোনো নিয়মকানুনই জানতেন না কিন্তু মনের মধ্যে ছিল দৃঢ় সঙ্কল্প- যেভাবেই হোক মঠে পৌঁছাতে হবে। খুব সম্ভবত তিনি সকাল দশটায় বেরিয়ে বিকেল চারটে তে মঠে পৌঁছেছিলেন, এবং মহাপুরুষ মহারাজের সাথে পরিচয় করেছিলেন। পরীক্ষার ফল বের হবার

পর কানাই আবার কলকাতায় চলে এল কলেজে পড়তে। ভর্তি হল বঙ্গবাসী কলেজে। প্রতি রবি-বার ও ছুটির দিনে নিয়ম করে মঠে যেতে শুরু করল সে। একদিন কানাই মঠে গেলে, মহাপুরুষজী তাকে পরম ধন্য করলেন। কথা শুরু হয়েছিল জপ-ধ্যানের সাধারন প্রশ্ন দিয়ে। এইসব কথার পরে মহাপুরুষজী হঠাৎ তার বুকে হাত দিয়ে গূঢ় কয়েকটা কথা বলেছিলেন। সেসব কথার তাৎপর্য তখন তিনি বোঝেননি এবং পরেও পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেননি। সবশেষে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে কি সম্পর্ক তাও বলে দিলেন। মহাপুরুষজী তাঁকে বুকে হাত দিয়ে বলেছিলেনঃ 'সৎ-চিৎ-আনন্দ সব এখানেই আছে। তা একদিন বুঝবে। এই জন্মেই তা বুঝতে পারবে বাবা'। বেলুড়মঠে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে কানাই এর পরিচয় হয় স্বামীজী, রাজা মহারাজ ও শ্রীশ্রী মায়ের সন্ন্যাসী সন্তানদের সঙ্গে। এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের। জ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর নির্দেশে আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। জ্ঞান মহারাজকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন লোকেশ্বরানন্দজী। কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয় তাঁরা যেন এক একটা প্রতিষ্ঠান। জ্ঞান মহারাজ সেই শ্রেনির একজন ব্যক্তি। তাঁর কথার মধ্যে ব্যক্তিগত কথা গৌন, মুখ্য হচ্ছে দেশ ও সমাজ। কথার মধ্যে হতাশা নেই, প্রধান সুর হচ্ছে এগিয়ে যাও। বাধা বিঘ্ন দেখে ভয় পেতও না। সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই'। আমারা দেখব লোকেশ্বরানন্দজীর গোটা জীবনের সুরও হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই- কোন হতাশাব্যঞ্জক কিছু নেই, নেতিবাচক কিছু নয়, সব ইতিবাচক।[২]

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কানাই ভর্তি হয়েছিলেন বঙ্গবাসী কলেজে, একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। লোকেশ্বরানন্দজী থাকতেন শ্রীমানী মার্কেটের উপর ঘর ভাড়া করে। সেই সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল। ভাইস প্রিন্সিপালরাও স্বদেশি করতেন। সেই আবহাওয়ায় কানাইও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পড়াশুনায় অবহেলা করতে শুরু করে। অবশেষে আই.এ পাশ করবার

পর সে কলেজে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেয়। বইপত্র বিলিয়ে দেয়। ঠিক করেন ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সে আর কলেজে আসবে না। কানাই তখন বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে নতুন নতুন যুবকদের স্বদেশি আন্দোলনে টেনে নিয়ে আসতে লাগল। ইংরেজ সরকারের পুলিশের সমালোচনা করার জন্য পুলিশ তার উপর নজর রাখতে লাগত। একদিন যখন কানাই ও তাঁর দাদা নৌকা করে কপোতাক্ষ পার হচ্ছেন, তখন সাদা পোশাকের এক পুলিশ তাঁদের দু'জনকেই নির্দয় ভাবে মেরে সারা শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। গ্রামে ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্বদেশি আন্দোলনের কাজ করে কানাই একবছর পর কলকাতায় ফিরে আসে। স্বদেশি আন্দোলনের তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কানাই আশাহত হয়ে পড়ে। সে পুনরায় কলেজে যোগ দেয় এবং ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রী নৃপেন ব্যনার্জী এবং ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শ্রীজিতেন চক্রবর্তীর হস্তক্ষেপে কানাই পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক সাধুর সঙ্গে কানাই এর তখন পরিচয় হয়েছে। কানাই তখন অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী অশোকানন্দের সাথে একই ঘরে থাকত।

কানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বি.এ. পাশ করলেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। বি.এ। পাশ করার পর কানাই রামকৃষ্ণ মিশনের দেওঘর  স্কুলে কিছু দিন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। তখনও তিনি ব্রক্ষ্মচারী হননি। তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে কয়েক বছর আগে। মঠে মহাপুরুষজী তাঁকে ডাকতেন 'লম্বা কানাই' বা 'দেওঘরের কানাই' বলে। বয়সে তরুন এবং সাধু না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্কুলে এক্জিকিউটিভ কমিটির একজন সদস্য করা হয়েছিল। কারন দক্ষ শিক্ষক হিসাবে অল্পদিনেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এরপর কানাই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘে যোগ দেন। তাঁকে সবাই ডাকতে লাগল ব্রক্ষচারী কানাই বা কানাই মহারাজ নামে। সংঘে যোগ দেওয়ার আরও একবছর তিনি দেওঘরে শিক্ষক হিসাবে রইলেন। লোকেশ্বরানন্দজী বলতেন স্বামী জগদানন্দজী

এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী এই দু'জনের কাছে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে উপনিষদ পড়তে হয়। তবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষজীর দেহত্যাগ হয়। এর কিছুদিন পর (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) হঠাৎই একদিন স্বামী মাধবানন্দজী কানাই মহারাজকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন মঠ-মিশনের সহ-সম্পাদক। বরাবরই মাধবানন্দজী কানাই মহারাজকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এরপর তিনি কানাই মহারাজকে বার্মায় জেড়ুবা দ্বীপে রিলিফের কাজের দায়িত্ব দেন এবং সেটি তিনি দায়িত্ব সহকারে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। এরপর রেঙ্গুনে কয়েকদিন কাটিয়ে কানাই মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। বেলুড় মঠে কিছুদিন থাকার পর ১৯৩৬ এর ডিসেম্বর মাসে কানাই মহারাজকে মঠ কতৃপক্ষ চেরাপুঞ্জীতে পাঠালেন। চেরাপুঞ্জী তখন আসামের অন্তর্গত। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রভানন্দ (কেতকী মহারাজ) চেরাপুঞ্জীতে একটি ছেলেদের স্কুল শুরু করেছিলেন। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের অধীন ছিল ঐ স্কুলটি এবং স্বামী ভূতেশানন্দজী ছিলেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। সরকার বা জনসাধারন কেউই স্কুলটির জন্য কোন আর্থিক সাহায্য দেয় না। উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব। কানাই মহারাজ গিয়ে দেখলেন মাত্র একজন ছাড়া আর কোন শিক্ষকেরই পড়ানোর কোন যোগ্যতা নেই। বেলুড় মঠ তাঁকে পাঠিয়েছিল স্কুলটির অবস্থার উন্নতি করতে। শিলং আশ্রমেরও আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাই কানাই মহারাজ তাঁর সারা মাস খরচ বাবদ দশ টাকার বেশী পেতেন না। সেই দশ টাকার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া, কাপড়চোপড়ের খরচ সব কুলোতে হত। যার ফলে অনেক সময় কানাই মহারাজকে একটা মাত্র ধুতি পরেও কাটাতে হয়েছে , স্নান করে ভেজা ধুতি গায়েই শুকোতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে থেকে তিনি কিছু সরকারী অনুদান পেতে শুরু করেন। এরপর থেকে স্কুলের আর্থিক কষ্টের অনেক সুরাহা হয়ে গেল এবং স্কুলটি ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে।[৩]

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কানাই মহারাজ যখন চেরাপুঞ্জীতে তাঁর আনুষ্ঠানিক ব্রক্ষ্মচর্য দীক্ষা হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞনানন্দজীর কাছে। ব্রক্ষ্মচর্য দীক্ষার জন্য তাঁকে বেলুড় মঠে আসতে হয়। নাম হয়ঃ ব্রক্ষ্মচারী সুব্রতচৈতন্য। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কানাই মহারাজ চেরাপুঞ্জী ছেড়ে চলে আসেন। মাএ চার বছর থাকলেও সেখানকার মানুষদের কাছে তিনি খুব ভালোবাসা পেয়েছিলেন। এরপর কানাই মহারাজকে বেলুড় মঠ কতৃপক্ষ আবার দেওঘরে পাঠালেন হেডমাষ্টার হিসাবে। সেখানে তিনি যেমন কঠোর ছিলেন। তেমনি ছাএদের ভালোবাসতেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘরে তাঁর ছাএ ছিলেন এবং তারপরও তাঁর সাথে বরাবর যোগাযোগ রেখেছেন এরকম একজন ভদ্রলোক বলেছেনঃ 'কানাইদা' কে বেশি বকাবকি করতে হত না। মৃদুভাষী সদাহাস্যময় ছিলেন বলে সামান্য গম্ভীর হলেই অনেক বকার কাজ হয়ে যেত। তাঁর ব্যক্তিত্বও সেরকম ছিল। তাঁর মিষ্টি ব্যবহারকে কখনো দুর্বলতা ভাবার উপায় ছিল না। উনি কিন্তু কখনো আমার সঙ্গে তথাকথিত ধর্ম প্রসঙ্গ করতেন না। তিনি বলতেনঃ কাজ কর। Be and make ; নিজে মানুষ হয়েছ, এবার অন্যকে মানুষ কর। কানাই মহারাজ দেওঘরে হেডমাষ্টার ছিলেন ১৯৪১ এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ এর শুরু পর্যন্ত। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রক্ষ্মচারী সুব্রতচৈতন্য মঠে এলেন সন্ন্যাসের জন্য। স্বামী বিরাজানন্দজী মহারাজের কাছে সন্ন্যাস পেলেন, নাম হল স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। এই নাম পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। সন্ন্যাস নিয়ে লোকেশ্বরানন্দজী আর দেওঘর ফিরে যাননি, এবার গেলেন মায়াবতী। তাঁকে ক্রমশ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সম্পাদক করা হবে এই ভেবেই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মায়াবতীতে গিয়ে তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন, দু-একবার পড়েও গেছিলেন। তাই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মায়াবতী থেকে তাঁকে পাঠানো হল রহড়ায়। সেখানে তিনি দু-মাস ছিলেন। তারপর বারানসী যেতে হল ফিস্চুলা অপারেশনের জন্য।

অপারেশন হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন বিশ্রাম করেছেন কাশী সেবাশ্রমে। এমন সময় মঠ থেকে চিঠি পেলেনঃ 'তোমাকে পাথুরিয়াঘাটা স্টুডেন্টস হোমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি মঠে চলে এস'। এই চিঠি পেয়ে লোকেশ্বরানন্দজী কিন্তু খুশি হলেন না। এই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠান খুব ভালো চলছিল না। পরপর বেশ কয়েকজন অধ্যক্ষ এলেন এবং গেলেন। ছাত্ররা একবার এক অধ্যক্ষের পেছনে এমন লাগল যে, তিনি পালিয়ে বাঁচলেন। তাই কোন সাধুই আর ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ হতে চাইছিলেন না। তাই লোকেশ্বরানন্দজী যখন মঠ থেকে চিঠি পেলেন তখন তিনি দুঃখিতই হলেন। অবশেষে ১৯৪৬ –এর মে-জুন মাসে লোকেশ্বরানন্দজী পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের কর্মভার গ্রহন করেন। যেদিন কাশী থেকে মঠে ফিরে এলেন সেদিনই সন্ধ্যায় পাথুরিয়াঘাটায় চলে এলেন। এরপরে ধীরে ধীরে আশ্রমে নানা জায়গা থেকে সাহায্য আসতে লাগল। সামর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই সঙ্গে বাড়তে লাগল গরীব ছাত্রদের সংখ্যাও। কিছুদিন পর দেশ স্বাধীন হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল উদ্বাস্তু সমস্যা শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বহু উদ্বাস্তু পরিবার এসে তখন আশ্রম নিয়েছিল, এদের মধ্যে ছিল অনেক স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও। লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ এরকম কিছু ছাত্রকে আশ্রমে এনে রাখলেন। এরপর ছাএসংখ্যা বাড়তে লাগল। পাথুরিয়াঘাটার আশ্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও চারপাশের পরিবেশ কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকুল ছিল না। আশ্রমের সামনের রাস্তা দিয়ে বাসরুট চালু হয়েছিল। দোকানও ক্রমশ বেড়ে চলছিল। তাছাড়া নতুন বাড়ির উওর দিকে যে খোলা জায়গা ছিল সেখানে সারারাত লরি জমায়েত হত এবং মেরামত হত। এরফলে ছাত্রদের পড়াশুনা, ঘুম কিংবা সাধনভজন সবেরই খুব ব্যাঘাত হত। লোকেশ্বরানন্দজী সবচেয়ে বেশি দুঃখের কারন হল ছাত্রদের কোন খেলাধূলার মাঠ ছিল না। লোকেশ্বরানন্দজী এইসব অসুবিধার কথা বেলুড় মঠকে জানিয়ে ছাত্রাবাস

অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন। মঠ কতৃপক্ষ অসুবিধেগুলি বুঝলেন এবং ছাত্রাবাসের জন্য জায়গা দেখতে অনুমতি দিলেন। জায়গা দেখা শুরু হল, প্রথমে তারা শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়ি নেওয়ার কথা ভাবছিলেন, এরপর লোকেশ্বরানন্দজী ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগে যোগাযোগ করলেন থিয়েটার রোডে (বর্তমানে শেক্সপীয়ার সরনি) এবং সেখানে তিনি এ.বি. চ্যাটার্জী এবং মন্ত্রী মিঃ মেহেরচাঁদ খান্নার সাথে দেখা করেন। তাঁরা তাকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। অবশেষে রাজপুরের কাছে উখিলা পাইকপাড়া নামে মুসলমান প্রধান একটি অঞ্চল লোকেশ্বরানন্দজীর পছন্দ হল। উনি ১০০ বিঘা জমি নেবেন ঠিক করলেন। কিছুদিন বাদে মঠ থেকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী নির্বানানন্দজী, স্বামী দয়ানন্দজী এবং আরও কিছু প্রবীন সন্ন্যাসী এসে জমি দেখলেন। তাঁদেরও খুব পছন্দ হল জায়গাটা। মঠ কতৃপক্ষ অনুমতি দিলেন জমি কেনার। সরকার জমির দখল নিয়ে মিশনকে হস্তান্তর করলেন ৩০ শে মার্চ ১৯৫৬। তখন মোট ২৬.৫৫ একর জমি নেওয়া হয়েছিল। মঠ-মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মানন্দ ভবনের ভিত্তি উৎসর্গ করেছিলেন ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই জানুয়ারী মকরসংক্রান্তির দিন। আর তার দু'দিন পর (১৬ ই জানুয়ারী) কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ই ডিসেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্রহ্মানন্দ ভবনের দ্বারোঘাটন করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার দিন ভবনের প্রার্থনা মন্দিরে পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজ ঠাকুরের ফোটো প্রতিষ্ঠা করেন। পাথুরিয়াঘাটা থেকে নরেন্দ্রপুরে উত্তরনের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাব, রামবাগানের কথা না বললে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সেখানে একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে স্কুল খোলা হল (নৈশ বিদ্যালয়)। এছাড়াও সেখানে সেলাই শেখার ব্যবস্থাও করে

দিলেন। অপুষ্টির জন্য এখানকার প্রায় সবাই অসুখে ভুগত। কিন্তু দারিদ্রের জন্য ওষুধ বা পথ্য সংগ্রহ করতে পারত না। মিশন থেকে এখন এক দাতব্য চিকিৎসালয় চালানো হচ্ছে। আর শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থাও হয়েছে। পানীয় জলের কষ্ট ছিল, তাও দূর হয়েছে। আশ্রম পাথুরিয়াঘাটা থেকে নরেন্দ্রপুরে চলে গেলেও রামবাগানের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়নি। সেখানে সারাদিন ধরে কর্মীরা নানারকম সেবামূলক কাজ করে। এসব সম্ভব হয়েছে লোকেশ্বরানন্দজীর হাতে তৈরী সেবক শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর গুনে।[৪]

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকেশ্বরানন্দজী একদিন দমদম বিমান বন্দর থেকে বিখ্যাত বিবেকানন্দ গবেষিকা গার্গীকে (মারী লুইস বার্ক) নিয়ে বেলুড় মঠে গেছেন। বেলুড় মঠে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বললেন কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ কালচারে গিয়ে সেখানকার দায়িত্ব নিতে। তিনি বেলুড় মঠ থেকে ইনস্টিটিউট অফ কালচারে চলে এলেন। যে নরেন্দ্রপুর তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, সেই বিরাট সাম্রাজ্যের মত আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে তিনি এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন না। পরবর্তীকালে তিনি বলতেনঃ 'ঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্রপুর ছেড়ে চলে আসতে আমার একবিন্দুও কষ্ট হয়নি। একবার হলেও মনে হয়েনি কোন কিছু হারিয়েছি'। ইনস্টিটিউট অফ কালচারে লোকেশ্বরানন্দজী এসেছিলেন ১৯৭৩ এর ২০ ডিসেম্বর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি এর অধ্যক্ষ ছিলেন। লোকেশ্বরানন্দজী যখন ইনস্টিটিউটে এলেন তখন সেখানকার বিশৃঙ্খল অবস্থা- নরেন্দ্রপুরে ১৯৬৯-এ যেমন হয়েছিল ঠিক সেরকমই। শুধু তফাৎ এই এখানে ইউনিয়ন গড়েছিল ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দল। বেশ কিছু কর্মী তাতে যোগ দিয়েছিল। নরেন্দ্রপুরের মত এখানেও তিনি সম্পূর্ণ কঠোর মনোভাব ধারন করলেন। অন্তত দুবার তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করার চেষ্ঠা করা হয়েছে। লোকেশ্বরানন্দজী নির্ভয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্ত

বিরুপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। অবশেষে মাসখানেক বিশৃঙ্খলার পর রাজনৈতিক দলটি আন্দোলন প্রত্যাহার করল। এরপর থেকে যে দীর্ঘ ২৫ বছর লোকেশ্বরানন্দজী ইনস্টিটিউটে কাটালেন, আর কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন বিশৃঙ্খলা হয়নি। ইনস্টিটিউটে শান্ত অবস্থা ফিরে এলে লোকেশ্বরানন্দজী ধীরে ধীরে ইনস্টিটিউকে গোছানোর কাজ শুরু করলেন। ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৯ শে জানুয়ারী দিনটিকে তিনি কর্মীদের 'Get together'- এ পরিনত করলেন। এখান থেকে প্রকাশিত হল 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' –এর মত গবেষনামূলক বৃহৎ গ্রন্থ, আবার একই সঙ্গে সুলভ মূল্যের অনেক। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে শোভাযাএা চালু করলেন লোকেশ্বরানন্দজী। সাধারন মানুষের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের যোগাযোগ বেড়েই চলল। তিনি শুরু করলেন ইংরেজীতে উপনিষদ ক্লাস। যুবকদের মধ্যে বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারের জন্য তৈরী করলেন ১৬ থেকে ৩০ বর্ষীয়দের জন্য 'বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল'। ১৯৭৮- এ প্রবল বর্ষনে কলকাতা প্লাবিত হয়ে থাকল কয়েকদিন। তাঁর নির্দেশে সাধু ব্রহ্মচারী ও কর্মীর দল জলবন্দি মানুষের জন্য এানকাজ করল কয়েকদিন।[৫]

ইতিমধ্যে বেলুড় মঠ ঠিক করল ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় কনভেনশন হবে। লোকেশ্বরানন্দজীকে কনভেনশন কমিটির সম্পাদক করা হল। এর পর থেকে তিনি ইনস্টিটিউটে, ভক্ত সম্মেলন করতে শুরু করলেন ঘনঘন, ক্রমশ সেই ভক্ত সম্মেলন খুব জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এর মধ্যে তিনি ইনস্টিটিউটে আর একটি নতুন বিভাগ যোগ করলেন, তা হল মিউজিয়াম। ছোট পরিসরে এই মিউজিয়ামে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক রূপরেখা পাওয়া যাবে- এই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিছুদিন পর খুললেন 'সারদা দেবী স্কুল অফ আর্টস ফর চিলড্রেন', বর্তমানে এই আঁকা শেখার বিভাগটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে লোকেশ্বরানন্দজী

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ থেকে আমন্ত্রন পেয়ে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন। অক্সফোর্ডে তিনি গীতার উপর বক্তৃতা করেন। শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যের গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে যা বক্তব্য, তার তুলনামূলক আলোচনাও করেন। এছাড়াও তিনি গিয়েছিলেন জার্মানী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স , সুইজারল্যান্ড ও ইতালি। অক্সফোর্ড ছাড়াও কেমব্রিজ ও সরবন্ ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করেছিলেন। এই সময়ই তিনি পোপ জন পলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পোপের নিজস্ব রেডিও 'ভ্যাটিকান রেডিও' থেকে 'একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর চোখে যীশুখ্রীষ্ট' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে গিয়েছিলেন আর্ন্তজাতিক শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে। ফেরার পথে তিনি তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কোয় নেমেছিলেন। তখন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান দুটি সংস্থা যারা খুবই প্রভাবশালী ছিল- অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সস এবং রাইটার্স ইউনিয়ন তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। এই দুটি সংস্থার সভ্যদের সঙ্গে তাঁর এত বন্ধুত্ব হয়েছিল যে, পরের বছর এদের সহযোগীতায় ইনস্টিটিউটে একটি আর্ন্তজাতিক শান্তি সম্মেলন হয়েছিল। রাশিয়ায় তিনি সাতবার গেছেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোয় একটি বেদান্ত সেন্টার স্থাপিত হয় এবং পরে তা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রে পরিনত হয়। ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুর মঠ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার যে শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে এবং ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের যে শতবর্ষ উৎসব পালিত হয়েছে। তিনিই ছিলেন তার প্রধান দায়িত্বে। বক্তৃতা সম্বেলন ও আলোচনাচক্রে যোগ দেবার জন্য যেসব দেশে আমন্ত্রিত হয়েছেন, তার মধ্যে আছেঃ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, মরিশাস, সোভিয়েত রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাটভিয়া।[৬]

তাঁর আমলে ইনস্টিটিউট একটি যথার্থ আর্ন্তজাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। ভারতবর্ষে তো বটেই, এর বাইরেও ইনস্টিটিউটের নাম ছড়িয়ে পড়ে। দেশ বিদেশের জ্ঞানী-গুনী ও গবেষকদের মিলনস্থলে পরিনত হয়েছে এই ইনস্টিটিউট। লোকেশ্বরনন্দজীর কথা মনে হয় তাঁর বিরাট হৃদয় ও উদার কথা। প্রচন্ড তারুণ্য ও প্রানশক্তির কথা। লোকেশ্বরানন্দজীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ধৈর্য্য ও শান্ত ভাব। খুব কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি অবিচল থাকতে পারতেন। তিনি তাঁর সাধুভাই ও কর্মীদের চালাতেন নিয়মের বাঁধন দিয়ে ততটা নয়, যতটা ভালোবাসা, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর ভালোবাসা ছিল নির্বিচার, মায়ের মত ভালবাসতেন সকলকে।অনেকে হয়ত এই ভালোবাসার অপব্যবহার করত, তবুও তিনি ভালোবাসতেন। যে কোন সাহসিকতার বা অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাজ তিনি পছন্দ করতেন। বয়সের তুলনায় লোকেশ্বরানন্দজীর শরীর কিন্তু আশ্চর্যরকমের ভালোছিল। নরেন্দ্রপুর থেকে গোকপার্কে আসবার পরপরই তাঁর দুটো অপারেশন হয়েছিল- গলব্লাডার ও প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের। এ সওর দশকের কথা। অফিসে ছিল তাঁর প্রধান তিনটি কাজ। প্রথমত, ইনস্টিটিউটের দৈনন্দিন কাজ। দ্বিতীয়ত, ক্রমাগত এসে যাওয়া ফোন একইরকম হাসিমুখে ধরা, তৃতীয়ত, অজস্র দর্শনার্থীকে দর্শন দেওয়া। ১৯৯৭ এর শেষে সবাই যখন রামকৃষ্ণ মিশনে শত বার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন জার্মানীর হামবোল্ড ইউনিভার্সিটিতেও রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করবে বলে জানায় এবং লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে আমন্ত্রন জানায়। নভেম্বর মাসে মহারাজজী জার্মানী যান ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। শুধু তাই নয় , ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩, ৪, ৭ ও ৮ ফেব্রয়ারি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন শতবার্ষিকীর যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়েছিল , যার তিনি ছিলেন কনভেনার, তাতেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি।[৭]

১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ ই নভেম্বর একদিনের জন্য গেলেন জয়রামবাটি, কামারপুকুরে। কামারপুকুরে ঠাকুরকে প্রণাম করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। অনেকক্ষন দু হাত জোড় করে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ফিরে এলেন গোলপার্কে। নভেম্বর মাসের ২২ তারিখে ভক্তদের নিয়ে মহারাজ গেলেন মস্‌লন্দপুরে রামদর্শনে, রাম-সীতা, দর্শন করে ফিরে এলেন নির্বিঘ্নে। ২৮ শে নভেম্বর প্রতিবারের মত এবারেও গেলেন স্বামী প্রমানন্দজী মহারাজের তিথিপূজা উপলক্ষে আঁটপুরে। ৪ ঠা ডিসেম্বরে ১৯৯৮–এ গেলেন বাঁকুড়া জেলার সোমসারে। এই গ্রাম শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর জন্মস্থান। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম'। তারপর এল ১৪ ই ডিসেম্বর সোমবার, মহাপুরুষ মহারাজের জন্মতিথি। প্রতিবারই তিনি এইদিন সকালে মঠে যান। বিকালে যান বারাসাতে। প্রমেয়ানন্দজী মহারাজের অনুরোধে মঠের নাটমন্দিরে মহাপুরুষজীকে নিয়ে বললেন আবার বারাসাতেও মহাপুরুষজীকে নিয়ে বললেন। ফিরে এসেই তিনি আবার রামমন্দির যাবার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠলেন। সেই অনুযায়ী ১৭ ই ডিসেম্বর রামমন্দির যাবার দিন ঠিক হল। চললেন মস্‌লন্দপুর-রামমন্দির দর্শনে। গত ৩০ বছরে এরকম কখোনো তিনি করেননি যে, একমাসেরও কম ব্যবধানে দুবার রামমন্দির গেছেন। মন্দিরে পৌঁছে রামকে মালা পরালেন, সীতাকে ফুলের মুকুট পরালেন, রামনাম শুরু হল। তারপর আরতি হল রামচন্দ্রের। তিনি দু-হাত জোড় করে রামকে দেখছেন। এই রামকে জানিয়েই সংসার ছেড়েছিলেন। মনে মনে বলেছিলেন, যদি ঠিক ঠিক সাধু হতে না পারি, তবে বুঝব তুমি মিথ্যে। তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই হিসাবই মিটাচ্ছিলেন কি তিনি ? নাকি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন, রাম তাঁর কথা রেখেছেন বলে ? না-কি আরো কোন মহৎ যাত্রার খবর রামকে

শুনিয়ে রাখছিলেন ? ফিরে এসে বলেছিলেনঃ 'ভারী তৃপ্তি পেয়েছি। ইচ্ছে করছিল, রামকে জড়িয়ে ধরি'।

২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৯৮, খ্রিষ্টমাস ইভ। প্রতিবার এইদিন ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলের মিটিং-এ প্রিসাইড করেন তিনি। শেষ মুহূর্তে মহারাজ জানালেন, শরীরটা ভালো নেই, তিনি যাবেন না। অন্য একজন সভাপতিত্ব করলেন তাঁর জায়গায়। ২৫ শে ডিসেম্বর নরেন্দ্রপুরে প্রাক্তন ছাত্রদের রি-ইউনিয়ন। মহারাজের একটু জ্বর জ্বর ভাব, তবুও গেলেন তিনি। পাথুরিয়াঘাটার ছাত্ররা সব একত্র হয়েছ ব্রম্ভানন্দ ভবনে। মহারাজকে পেয়ে তাদের আনন্দ আর ধরে না- তাদের 'বড়ো মহারাজ'। বড় মহারাজও খুব খুশি।[৮]

২৮ তারিখ সকালে অন্যদিনের মত চারতলার বিবেকানন্দ হলের বারান্দায় বেড়াচ্ছেন। কিছুক্ষন পরে সঙ্গের ব্রক্ষ্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'ইনস্টিউটের ফাউন্ডেশন ডে-টা কবে ? ব্রক্ষ্মচারী বললেনঃ '২৯ শে জানুয়ারী', মহারাজ বললেনঃ এখনও একমাস ? বেড়ানো হয়ে গেলে তিনতলার লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে অতিথি ভবনের দু-একজনের সাথে কথা বললেন। তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন ফাইন্ডেশন ডে-টা কবে ? '২৯ শে জানুয়ারী,' মহারাজ বললেনঃ উপনিষদটা কবে বেরোচ্ছে ? ২৮ শে জানুয়ারী বইমেলায় বেরোবে শুনে চুপ করে গেলেন। সেদিন বিকেলে ছিল সুরেন্দ্র পল লেকচার। খুবই সন্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ন বক্তৃতা। এই দিন সকাল থেকেই মহারাজের পেটে ব্যাথা ও জ্বর শুরু হল। এগারোটা নাগাদ মহারাজকে হুইল চেয়ারে করে ঘর থেকে বার করা হল। তারপর তিনি ঠাকুর ঘরে গেলেন। ঠাকুর প্রনামের পর যেতে যেতে জনৈক সন্ন্যাসীকে সুরেন্দ্র পল লেকচারের welcome address এর দু-লাইন dictate করলেন।এরপর মহারাজকে গাড়ী করে নিয়ে যাওয়া হল কোঠারী হাসপাতালে এবং তিনি ভর্তি

হলেন ন-তলার ৯০৩৬ নং ঘরে। এই সেই ঘর যেখানে চারমাস আগে পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজও উঠেছিলেন। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে হার্নিয়ার কমানোর জন্য ঔষুধ দিলেন। মহারাজের ব্যথা কমল কিন্তু জ্বর রয়ে গেল। কিছুক্ষন পরে মহারাজের শ্বাসকষ্ট শুরু হল। ডাক্তারেরা নেবুলাইজার রেডি করতে লাগলেন। মহারাজ এইসময় বললেনঃ 'জপের মালা আনো। ঠাকুরের ছবি দাও। 'তারপরই নেবুলাইজারের মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে দেওয়া হল। মহারাজের কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। তবে যে ব্রম্ভচারী- সেবক মহারাজকে ধরে ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর মনে হল, মহারাজ যেন একটানা বলে যাচ্ছেনঃ 'মা, মা, মা'। এরপর মহারাজকে ভেন্টিলেটর দিয়ে কৃএিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হল। ২৯ ও ৩০ তারিখ একইভাবে কাটল। মহারাজের অসুস্থতার খবর কাগজে বের হতে লাগল প্রতিদিন। কলকাতার মেয়র তাঁকে দেখতে গেলেন। নোবেল – জয়ী অমর্ত্য সেন তাঁর আরোগ্য কামনা করে পুষ্পস্তবক ও চিঠি পাঠালেন। রাজ্যের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন প্রতিদিন ৫-বেলা খোঁজ নিতে লাগলেন মহারাজের। তিনি ছিলেন মহারাজের ব্যক্তিগত বন্ধু। মাত্র দেড় মাস আগে রাষ্ট্রপতি যখন কলকাতায় এসেছিলেন, শুধুমাত্র মহারাজকে দেখার জন্যই ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। ৩১ তারিখ ভোর রাতে হঠাৎ আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘটল হৃদরোগের আক্রমন। অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে দেখে উপস্থিত সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে খবর দিলেন, খবর দিলেন ইনস্টিটিউটে, নরেন্দ্রপুরে এবং কলকাতার সমস্ত কেন্দ্রে। সাড়ে ছ-টা নাগাদ ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাসী গঙ্গাজল দিলেন মহারাজের মুখে। ৭-২৫ মিনিটে মহারাজ দেহত্যাগ করলেন। উপস্থিত সন্ন্যাসী সেই খবর জানিয়ে দিলেন ইনস্টিটিউটে ও বেলুড় মঠে।

আটটার মধ্যে কোঠারী হাসপাতালে পৌঁছাতে শুরু করলেন বেলুড় মঠ ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সন্ন্যাসীরা। মহারাজের দেহ ইনস্টিটিউটে আনা হল সাড়ে ন-টা নাগাদ। রাখা হল বিবেকানন্দ হলের নীচে ফয়ারে। ততক্ষণে মহারাজের দেহত্যাগের খবর আকাশবানীতে ঘোষনা করা হয়েছে। অগনিত ভক্ত দলে দলে ছুটে আসতে লাগলেন ইনস্টিটিউটে। কান্নায় ভেঙে পড়ে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন আশেপাশের রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও। শোকবার্তা পাঠালেন রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেনঃ 'শিক্ষায় ও মানুষের সেবায় তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন, তাঁর অভাব আমাদের রাজ্যে প্রভূতভাবে অনুভূত হবে'। এছাড়া শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেলেনঃ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অশোক ভট্টাচার্য, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সঙ্গীত শিল্পী অজয় চক্রবর্তী, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, সাহারা ইন্ডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং আরও অসংখ্য ছোট-বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।[৯]

লোকেশ্বরানন্দজী ভক্তদের কাছে অনেকবার বলেছেনঃ 'I want to die in harness', মার কাছে প্রার্থনা কর, কাজ করতে করতে চলে যেতে চাই, সেইভাবেই চলে গেলেন তিনি। ২৮ তারিখে সকালেও বৃহদারন্যক উপনিষদের কিছুটা অনুবাদ করেছেন। হুইল চেয়ারে করে হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে dictation দিয়েছেন এক সন্ন্যাসীকে। তাঁর ৩২ বছরের সঙ্গী সেবক কর্মীটিকে লোকেশ্বরানন্দজী একদিন বলেছিলেনঃ 'দেখ, কিছুতেই ভয় পেয়ো না, ভয় পেলেই পিছিয়ে পড়বে। ভয় পেতে নেই। মাথা উঁচু করে চলবে। মিলিটারিদের দেখনি? গুলি খায়, পড়ে যায়, তবুও এগিয়ে চলে। তেমনি হতে হবে'। আদর্শকে সামনে এমনি অকুতোভয় পদযাত্রাই

লোকেশ্বরানন্দজী সর্বদা করে এসেছেন। চলে গেলেন তিনি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গেলেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে এক অবিস্মরনীয় জীবন।[১০]

# তথ্যসূত্রঃ-


১। DR. Prasanta Kumar Giri, *A Tribute To Swami Lokeswarananda centenary volume*, Narendrapur Ramkrishna Mission Praktani, Kolkata, 2009,page: 91-94.

২। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,*শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, নানৃতম স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি,* সাইবার গ্রাফিক্স,কলকাতা, ২০০৯,পৃষ্ঠা : ১০-১৬

৩। স্বামী বলভদ্রানন্দ, *স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এক অনন্য জীবন,* নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রাক্তনী শ্যাডো পয়েন্ট, কলকাতা,১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা: ১১-৩৩

৪। স্বামী চিদরূপানন্দ, *স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,* পুনশ্চ, ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রেস, কলকাতা, ২০১০,পৃষ্ঠা: ১১-৩৩

৫। স্বামী সুর্পনানন্দ, *চিরন্তরে পঁচাওর (১৯৩৮-২০১৩),* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কালকাতা, ২০১৬,পৃষ্ঠা: ১৪৭-১৫৫

৬। Swami Lokeswarananda*, In pictures A birth centenary tributes*, Nanritam Pelican Press, Kolkata, 2009, Page: 46-85

৭। Sri Kalipada Mandal*, UTSA Swami Lokeswarananda Commemorative volume No. 41*, Ashrama Chhatrabas Praktani, Narendrapur, Phalguni Press,South 24 Parganas, 1999,Page: 94-95

৮ । Probodh Chandra Sen Gupta, *Swami Lokeswaranandaji*, Bani Sengupta, Dattco,Kolkata,2007 ,Page: 96

৯। অমিতাভ দাশ, *স্মৃতির আলোকে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,* তন্দ্রিতা চন্দ্র (ভাদুরী), রিডার্স সার্ভিস, ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৮,পৃষ্ঠা: *২১৮-২২২*

১০। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: *৫৪*

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কর্মজীবন

উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ঠিকানা ১৮,যদুলাল মল্লিক রোড, কলকাতা। আশ্রম একটি ছাত্রাবাস। ছাত্ররা এখানে থাকে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ছাত্ররা সকলেই মেধাবী। এরা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। অনেকেই দুঃস্থ পরিবারের সন্তান। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী লোকশ্বরানন্দজী মহারাজ। ছাত্রদের অতি প্রিয় মহারাজ। তিনি নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে অতিকষ্টে আশ্রমটি পরিচালনা করেন। ছাত্রদের নিরুদ্বেগে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিতে মহারাজের চেষ্টার অন্ত নেই। বিভিন্ন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রমের ছাত্রদের সুনামও ছিল।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দারুন দুর্ভিক্ষ হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। এই সময়ে রাসবিহারী মল্লিক নামে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার এক ভদ্রলোক হঠাৎ বেলুড় মঠে একটা চিঠি লিখলেন। তিনি বললেন যে, তিনি বেলুড়ে কিছু টাকা (পয়ঁতাল্লিশ হাজার টাকা) দান করতে চান এবং একটি বাড়ি দান করতে চান। তাঁর চিঠিতে আর একটি শর্ত ছিল যে, বাড়ীটিতে একটা দাতব্য সেবাসদন করতে হবে। রুগীরা আসবে, বিনা পয়সায় ঔষধ পাবে। আবার দরকার হলে রুগীরা থাকবে সেখানে। কিন্তু তাঁকে মঠ থেকে বলা হয় যে, বরং এটা একটা ছাত্রাবাস হোক। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কত গরিব অথচ বুদ্ধিমান ছেলের আজ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে পড়াশোনা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছু দরিদ্র ও মেধাবী ছেলেকে এখানে রাখা যেতে পারে। তারা এখানে

থেকে বিভিন্ন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করবে। তাদের মধ্যে কেউ পয়সা দিতে পারলে দেবে, কেউ না দিতে পারলে দেবে না। এইভাবে একটা ছাত্রাবাস গড়ে তোলা হবে গরিব, দুঃস্থ ছাত্রদের জন্যে। ভদ্রলোক তাতে সম্মত হলেন। পাথুরিয়াঘাটার ওই বাড়ীতে ছাত্রাবাসের পত্তন হল। নাম হল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ব্র্যাকেটে লেখা হলঃ ছাত্রাবাস। ১৯৪৩ সালেই অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গোটা তিনেক ছেলে নিয়ে ছাত্রাবাসটি আরম্ভ হল। ছাত্রাবাসের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন স্বামী হিতানন্দ(হিরন্ময় মহারাজ)। এই ছাত্রাবাসের কিন্তু প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দু'জন একজন পরেশ মহারাজ- স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ যিনি তখন মঠ - মিশনের সহকারী সম্পাদক, আর ছিলেন নলিনী মহারাজ স্বামী সারদেশ্বরানন্দ। বছরখানেক পর স্বামী হিতানন্দ চলে গেলেন ওখান থেকে। এমতাবস্থায় নলিনী মহারাজ লোকেশ্বরানন্দজীকে এখানে ডাকলেন এবং শুধুমাত্র নলিনী মহারাজের কথায় তিনি এখানে এলেন। তিনি যখন পাথুরিয়াঘাটায় এলেন, তখন আশ্রমে গোলমাল হয়ে গেছে বলে আশ্রম থেকে ছেলেদের সব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষের কোনো ক্ষমতাই ছেলেরা মানতে রাজি নয়। ১৯৪৬ সালে জুন মাসে লোকেশ্বরানন্দজী স্টুডেন্টস হোমের ভার নিলেন। খুব কষ্টে কাটছিল। দিন সাতেকের মধ্যে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। লোকেশ্বরানন্দজী বলেছেনঃ 'শ্রী শ্রী ঠাকুরের এমন কৃপা ; আমি ওখানে আসার পর দিন সাতেকের মধ্যে ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি থেকে একটা চিঠি এল। চিঠিতে তাঁরা লিখলেন ' আমরা শুনেছি আপনারা গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের ছাত্রাবাস চালাচ্ছেন। আমরা আপনাদের ছাত্রদের জন্য এই জিনিসগুলি দিতে চাই- আইসক্রিম, পাউডার, লজেন্স, চিজ, পিনাট, বাটার, মিল্ক প্রভৃতি। আপনারা এসে আমাদের কাছ থেকে জিনিসগুলি নিয়ে গেলে খুশি হব'। ইন্ডিয়ান রেডক্রশ কিছুদিন পর আশ্রমে প্রচুর বই, টেবিল-চেয়ার, আলমারি দান করলেন। এই আরম্ভ হল আশ্রমের ঐশ্বর্য। নানা

জায়গা থেকে নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য আসতে লাগল।[১] প্রত্যেক বছরই গরিব ছেলের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

## ২.১ নরেন্দ্রপুর ও ব্রহ্মানন্দ ভবন প্রতিষ্ঠাঃ

লোকেশ্বরানন্দজী আসার এক বছর পরে দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশবিভাগের ফলে ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ উদবাস্তু সমস্যার সম্মুখীন হল। শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বহু উদবাস্তু পরিবার এসে তখন আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল অনেক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও। লোকেশ্বরানন্দজী এরকম কিছু ছাত্রকে আশ্রমে এনে রাখলেন। ছাত্রদের থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে বাল্যবন্ধু হরেনচন্দ্র সাহার সহযোগীতায় বাড়ীটি তিনতলা করা হল। এছাড়া আর যারা সাহায্য করতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল প্রানশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং কানাইলাল ঘোষ। এরকম ভালোয়- মন্দয় চলার পথে তিনি একদিন শুনলেন তার পাশের ২০ নম্বর নতুন বিরাট সুন্দর বাড়িটি বিক্রী হতে চলেছে। এবং সেটির মূল্য আড়াই লক্ষ টাকা ধার্য হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ড.ডি.এম সেনকে জানালেন। ড.ডি.এম সেন বললেনঃ 'আমরা আপনাদের এক লাখ টাকা অনুদান হিসাবে দেব এবং আর এক লাখ টাকা ঋণ দেব তার জন্য কোনো সুদ দিতে হবে না'। অবশেষে মঠ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার দিল এবং বাড়ীটা কেনা হল। অবশ্য কেনা ঠিক বলা যাবে না। সরকারের মারফত বাড়ীটি সংগ্রহ করা হল। এখন দুটি বাড়ী মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫৬ জন। তবে সমস্যা ছিল বাড়ীটির সামনে রাস্তা থাকার কারনে খুব শব্দ হতো ফলে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটত এবং ছাত্রদের জন্য খোলা মাঠ, শান্ত পরিবেশ ছিল না। এজন্য নতুন কোনো জায়গার খোঁজ

চলছিল। এইসব ভেবেচিন্তে লোকেশ্বরানন্দজী ঠিক করলেন সরকারের উদবাস্তু পুর্নবাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে হবে। খোঁজ নিয়ে তিনি জানালেন, ভারত সরকারের উদবাস্তু পুর্নবাসন দপ্তরের একটি শাখা অফিস কলকাতাতেই আছে। লোকেশ্বরানন্দজী টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে কলকাতা অফিসের ঠিকানা বের করলেন। থিয়েটার রোডে (বর্তমানে শেক্সপিয়ার সরণি) এখন যেখানে অরবিন্দ ভবন হয়েছে সেখানে অফিসটি ছিল। ওই অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার তখন ছিলেন মি. এ. বি চ্যাটার্জি, আই. সি. এস জয়েন্ট সেক্রেটারি, গভঃ অফ ইন্ডিয়া। বিভাগীয় মন্ত্রী মি. মেহের চাঁদ খান্না এবং সচিব বসেন দিল্লী অফিসে। তিনি মি. এ. বি. চ্যাটার্জিকে একটা ফোন করলেন এবং আধঘন্টার মধ্যে অফিসে গিয়ে দেখা করলেন এবং ২০০ জন ছাত্রকে রাখার ব্যবস্থার কথা বললেন শুনে তাঁরা বললেন যে, তাঁরা পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে পারেন। এরপর লোকেশ্বরানন্দজী মন্ত্রীকে দক্ষিনেশ্বরের কিছু শম্ভু মল্লিকের বাগান বাড়ীটা দেখালেন কিন্তু মি. খান্নার সেটা পছন্দ হল না। শেষে রাজপুরের কাছে উখিলা-পাইকপাড়া নামে একটি মুসলমান প্রধান পল্লী সেখানে অনেক খোলা জায়গা পড়ে ছিল। সরকার থেকে ওখানে উদ্‌বাস্তুদের কলোনি করবে বলে অনেক জমি সরকার নিয়ে রেখেছিল। অধিগ্রহনের সব ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়েছিল। শুধু জমির দখল ওরা নেয়নি তখনও। জায়গাটা সবারই পছন্দ হল। লোকেশ্বরানন্দজী বললেন, সব ঠিক আছে। তবে জায়গাটা এখন আমাদের মঠ- কর্তৃপক্ষ দেখবেন। ওঁদের জায়গাটা পছন্দ হলে এবং ওঁরা অনুমতি দিলে এ বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা করা যাবে। সরকারপক্ষ তাতে রাজি হলেন। লোকেশ্বরানন্দজী মঠ কর্তৃপক্ষকে সবকিছু জানালে মঠ থেকে পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী নির্বানানন্দজী, স্বামী দয়ানন্দজী এবং আরও কয়েকজন প্রবীন সন্ন্যাসী জায়গাটা দেখতে এলেন। সেটা ছিল ১৯৫৬ সালের কালী পূজার পরের দিন এবং

জায়গাটাও তাদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। মঠ থেকে জমিটি কেনার জন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পাওয়া গেল এবং সরকার জমির দখল নিয়ে হস্তান্তরিত করলেন। সরকার তিনটি প্লটের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু মাঝখানে একটা প্লট- সেটা ছিল ইসপাহানি নামে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের। সেটা তখনও পাওয়া গেল না। এ নিয়ে মামলা ও হল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ওরা মামলায় হেরে গেল। আইনানুসারে জমির অধিকার আশ্রমের হাতে ফিরে এল। বাড়ী তৈরীর কাজ আরম্ভ হল। আশ্রমের ছেলেরা তখন ওখানে কিছু কিছু এসে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে শুরু করেছে। ওখান থেকেই তারা তাদের কলেজ যেত। মঠ মিশনের তৎকালীন সাধারন সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ নতুন আশ্রম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। তাঁর উখিলা – পাইকপাড়া নামটি মোটেই পছন্দ ছিল না। ওই অঞ্চলে 'পুর' দিয়ে অনেক জায়গার নাম আছে জেনে সেগুলির সাথে সংগতি রেখে তিনি বললেনঃ "নরেন্দ্র স্বামীজীর ছেলেবেলার নাম, জায়গাটার নাম স্বামীজীর নামেই হোক 'নরেন্দ্রপুর'। সেই অনুসারে ওই জায়গাটার নামকরণ করা হল নরেন্দ্রপুর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের কৃপায় আশ্রমের বাড়ীটি হয়ে গেল। এটিই নরেন্দ্রপুর আশ্রমের প্রথম বাড়ী। আশ্রমের এই প্রথম বাড়ির নাম রাখা হল ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রনন্দের নামে- 'ব্রহ্মানন্দ ভবন'। মঠ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মানন্দ ভবনের ভিত্তি উৎসর্গ করেছিলেন ১৯৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মকর সংক্রান্তির দিন। আর তার দু'দিন পর (১৬ই জানুয়ারী) কেন্দ্রীয় উদ্‌বাস্তু ও পুর্নবাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না ভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ১৯৫৮ সালে ৫-ই ডিসেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্রহ্মানন্দ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং ১৯৫৯ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার দিন ভবনের প্রার্থনা মন্দিরে পূজনীয় শঙ্করাচার্য মহারাজ ঠাকুরের

প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর পাথুরিয়াঘাটা থেকে ছাত্ররা এসে ব্রহ্মানন্দ ভবনে থাকতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে নরেন্দ্রপুরে পোষ্টঅফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সব হল। মেহেরচাঁদ খান্না ছাত্র আরও বাড়াতে বললেন এবং স্কুল , কলেজ তৈরীর কথা বললেন।[২]

## ২.২ নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ

পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বিখ্যাত সারস্বত সাধনার পবিত্র পীঠভূমি নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হল। মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫৪) সুপারিশ অনুযায়ী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট হল। ১৯৫৮ সালের ৩ রা মার্চ সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের ভিত্তি উৎসর্গ করলেন। ১৯৫৮ সালের ২২ শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু হল। তখন বিদ্যালয়ের নাম ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী আবাসিক বিদ্যালয়। নবম শ্রেনী থেকে পাঠদান শুরু হল। প্রথম বছরে বিজ্ঞান কলা ও কারিগরি বিভাগ দিয়ে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হল। তিনটি বিভাগে বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠন শুরু হল তখনও বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরী না হওয়ায় নির্মীয়মান ব্রহ্মানন্দ ভবনের এক তলায় গোটা চারেক ঘরে ক্লাস শুরু হয়। নরেন্দ্রপুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ অনুদান আসত কেন্দ্রীয় সরকারের উদবাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তর থেকে। তাই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাংশ ছাত্র তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তান থেকে আগত উদ্‌বাস্তু পরিবারের ছেলেদের মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে বলে স্থির হয়। সেই অনুযায়ী ধুবুলিয়া

উদ্‌বাস্তু শিবির, রানাঘাটের রুপশ্রীপল্লী উদবাস্তু শিবির, মেদিনীপুরের দুধকুন্ডি উদ্‌বাস্তু শিবির ও আন্দুল বয়েজ হোম থেকে মেধাবী ছাত্রদের নির্বাচন করা হল। অবশ্য এর বাইরে কলকাতা ও তার আশপাশ থেকে থেকেও কিছু ছাত্র নেওয়া হল।

স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষে শিক্ষাপদ্ধতি কেমন হবে সে সম্পর্কে ১৯৫৪ সালে গঠিত মুদালিয়র কমিশন দু-টি স্তরের সুপারিশ করেছিলেন। একটি বেসিক স্তর বা প্রাথমিক পাঠক্রম। যেখানে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পঠন-পাঠন হবে, পরে তিন বছরের একটি উচ্চমাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ নবম, দশম, একাদশ শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম এবং পরবর্তী স্তরে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স। এই সুপারিশের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য হল কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পাঠদান সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীরা যাতে হাতে কলমে জ্ঞানার্জন করতে পারে তারও ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষান্তে তারা নিজেরাই কর্মসংস্থান করে নিতে পারবে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নরেন্দ্রপুরে নবম শ্রেনী থেকে পাঠক্রম চালু করা হল। প্রথমে বিজ্ঞান, কলা, ও কারিগরি বিভাগ খোলা হল। উল্লেখ্য এই নবকল্পিত শিক্ষাক্রম ভারতের বিভিন্ন স্থানে গৃহীত হলেও কোথাও তেমন তেমন সাফল্য লাভ করেনি। কিন্তু নরেন্দ্রপুরে আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয় এ পাঠক্রম অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করেছে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের কাছ থেকে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রপুরের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গোটা ষাটের দশক জুড়ে নরেন্দ্রপুরের বিশাল কর্মযজ্ঞ রমরমিয়ে চলল। নরেন্দ্রপুরের এই খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল ও সুনামের মূলে আছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দের মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। বড়ো মহারাজের দক্ষ পরিচালনায় অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে নরেন্দ্রপুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচিতি লাভ করে সর্বত্র। বড়ো মহারাজের স্নিগ্ধমধুর ব্যবহারে, তাঁর ব্যক্তিত্বের অদ্ভুদ আকর্ষণে বহু জ্ঞানীগুনী শিক্ষাবিদ

নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। লোকেশ্বরানন্দজী নিজ মুখেই বলেছেন – "নরেন্দ্রপুরের এই যে সাফল্য। এর পিছনে রয়েছে দেশের বহু সহৃদয় মানুষের সহানুভূতি – ছোটো, বড়ো, মাঝারি সব শ্রেণীর মানুষের। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গেছি- যেমন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য করতে উন্মুখ দেখেছি, তেমনি সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি বিভিন্ন দপ্তরের পিয়োন, চাপরাশি, সাধারণ কেরানি সকলের কাছে। তবে সকলের মধ্যেও বিশেষ করে মনে পড়ে মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার কথা। আর তাঁর সংযুক্ত সচিব মিষ্টার এ. বি. চ্যাটার্জীর কথা। আর একজনের কথা না বললে নরেন্দ্রপুরের ইতিহাসের কাহিনী অসম্পূর্ন থেকে যাবে, তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন শিক্ষাসচিব ড. ডি.এম.সেন"। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে স্কুল বাড়ীর উত্তর দিকের অংশটা তৈরী হলে স্কুলের ক্লাস ব্রহ্মানন্দ ভবন থেকে এখানে নিয়ে আসা হল। এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বছরের ছেলেরা এসে গেলে প্রথম বছরের ছেলেরা দশম শ্রেনীতে উঠে গেল। দ্বিতীয় বছরে স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারীর আরও একটি বিভাগ এ্যাগ্রিকালচার খোলা হল। মোট চারটি Stream এর ক্লাসের জন্য অনেকগুলি ঘর দরকার। ল্যাবরেটরিগুলিও তখন ধীরে ধীরে সাজানো হচ্ছিল – Physics, Chemistry এবং Biology' র ল্যাবরেটরি। এই শেষোক্ত কাজে শম্ভুদা এবং আশ্রমের সিনিয়র ছাত্র যারা অনেকেই তখন স্কুলে আংশিক সময়ের শিক্ষক ছিলেন, তারা প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। Technology stream এর workshop এর জন্য স্কুলের পিছনে পূর্বদিকে একটি শেড তৈরী করা হল, নীচে থাকা এ্যাসবেস্টস। workshop টি যথোপযুক্তভাবে গড়ে তুলবার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের দু'জন অধ্যাপক – অরুন গুপ্ত এবং গিরিজা প্রসাদ পাল স্কুলে যাতায়াত শুরু করলেন। তখনও কলেজ বাড়ী, অডিটোরিয়াম বা সেন্ট্রাল অফিস কিছুই তৈরী হয়নি। কলেজ বাড়ী তৈরী হয়েছে

আরও পরে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে, সেন্ট্রাল অফিস ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং অডিটোরিয়াম এর কাছাকাছি সময়ে।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে নতুন ছেলের দল আসায় আশ্রমের এগারো ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারী মাল্টিপারপাস স্কুল পূর্ণ কলেবর পেল। প্রথম বছরের ছেলেরা তখন একাদশ ক্লাসে উঠেছে। নতুন ছেলেরা নবম ক্লাসে এল, দশম ক্লাসে রয়েছে দ্বিতীয় বছরের ছেলেরা। আবার এই একই বছরের কমার্স এবং ফাইন আর্টস শাখা দুটি চালু করবার ফলে হায়ার সেকেন্ডারীর দুটি শাখা নিয়ে নরেন্দ্রপুর স্কুল পরিপূর্নতার গৌরব পেল। যতদূর জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অপর কোন স্কুলই তখন দুটি শাখা চালু করতে পারেনি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা ছিল। প্রথম বছরের তুলনায় পরীক্ষার ফল হয়েছিল সন্তোষজনক। হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল এখন পূর্ণ, সমৃদ্ধ। স্কুলে এমন ছটি Stream-ই পড়াশুনা হচ্ছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্কুল তাঁর পূর্ণ কলেবর পেল, প্রতি Stream-এ তিনটি করে অর্থাৎ আঠারোটি ক্লাস চালু হল পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু মহারাজের মনে এখনও অতৃপ্ত ছিল। প্রথম থেকেই তিনি মাঝে মাঝে বলতেন- "আরও ছোট ছেলেদের এনে আশ্রমের শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হয়। "তাঁর তখন একান্ত ইচ্ছা এইসব ছোট ছেলেদের এনে আশ্রমের শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হয়"। তাঁর এই একান্ত ইচ্ছা এইসব ছোট ছেলেদের আশ্রমে রেখে তাদের 'man making education' দেওয়ার চেষ্টা করা। মহারাজের ইচ্ছাশক্তি দুর্বার, স্বামীজীর ভাষায় "gigantic will which nothing resist"- স্বামীজীর এই বানীকে লোকেশ্বরানন্দজী বহুবার তার বহু কাজে দেখিয়েছেন, ছোট ছেলেদের দায়িত্ব নিয়ে রাখার বহু অসুবিধা। কিন্তু মহারাজের ইচ্ছা সেই বাধা মানল না। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল থেকে আলাদা ক্যাম্পাসে নরেন্দ্রপুরে VI-VIII ক্লাসযুক্ত তৎকালীন সিনিয়র বেসিক স্কুল শুরু হয়ে গেল।

কর্মীভবনের ঝিলের পূর্বদিকে নিবিড় গাছপালায় ঘেরা নির্জন প্রকৃতির কোলে হল ছোটদের এই স্কুল। স্বামী উমানন্দ- ডাকনাম পরমেশ্বর, তখন ব্রহ্মচারী বিভুচৈতন্য হলেন এই স্কুলের হেডমাষ্টার। প্রথম বছর ক্লাস VI-এ ছাত্রদের ভর্তি করা হল। পরবর্তী দু'বছরে ক্লাস VII এবং VIII পূর্ন হল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল পরিপূর্নতা লাভ করল। ওখানে ছোট ছেলেদের জন্য তিনটি হোস্টেল তৈরী হল – অদ্বৈতানন্দ ভবন, অভেদানন্দ ভবন এবং নিরঞ্জনানন্দ ভবন। তৈরী হল কয়েকটি খেলার মাঠ এবং আনুষঙ্গিক আরও সব। বনানী ঘেরা অথচ আধুনিক সুবিধাযুক্ত এই স্কুলটি শিশুদের আত্মবিকাশের এক আদর্শ বিদ্যাপীঠ। এই স্কুলের জন্য এলেন আলাদা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী, এলেন কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারীও। হেডমাস্টার স্বামী উমানন্দের সুনিপুণ পরিচালনায় স্কুলটি বেড়ে উঠল নিজস্বগতিতে। ছোটদের স্কুল আরম্ভ হবার (১৯৬১) পর থেকে ছাত্র ভর্তি করা হ'ত ক্লাস VI এ জুনিয়ার সেকশনে এবং ক্লাস IX এ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে। এ ব্যবস্থা বজায় রইল তিন বছর – যতদিন না প্রথম বছরের ক্লাস VI এর ছেলেরা ক্লাস IX এ উঠেছে। তারপর থেকে ভর্তি করা হতে লাগল শুধু ক্লাস VI- এ। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাস VI থেকে XI পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর স্কুল তখন পূর্ণমাত্রা পেয়েছে।[৩]

পরমেশ্বর মহারাজের তত্ত্বাবধানে ভালোই চলছিল সিনিয়র বেসিক স্কুল। কিন্তু বেসিক শিক্ষার পাঠক্রম ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং শীঘ্রই তা অনুভূত হল। দুটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসন পদ্ধতিতেও অনেক অসুবিধা হতে লাগল। হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের হেডমাষ্টার তখন ব্রহ্মচারী গিরিশ চৈতন্য (স্বামী প্রভানন্দ)। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে আশ্রম ম্যানেজিং কমিটি তখন স্কুলের ব্যাপারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল – প্রথমত, স্কুলের নামটি পরিবর্তন করা হল। 'রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল মালটিপারপাস স্কুল' নামটি পরিবর্তন করে নতুন নামকরন করা হল 'রামকৃষ্ণ

মিশন বিদ্যালয়'। অন্যদিকে আবার এগ্রিকালচার stream – এ ভাল ফল করার পরেও দেখা গেল এই ছেলেরা B.Sc. (Ag) পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার টেকনোলজিতে ভাল ফল করেও ছাত্ররা ইঞ্জিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। সেখানে সুযোগ পাচ্ছে বিজ্ঞান শাখার ভাল ছাত্ররা। কাজেই তখন থেকেই মালটিপারপাস কোর্সের অকার্যকারিতা অনুভূত হয়েছে এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে – শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। তখন থেকে 10+2 প্রথা অর্থাৎ দুই বছরের হায়ার সেকেন্ডারী কোর্স চালু হয়েছে এবং বর্তমান স্কুলটি V থেকে X ক্লাসের একটি মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। এর আগেই ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে স্কুলে ক্লাস V যোগ করা হয়েছিল। আশ্রম ম্যানেজিং কমিটির দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের শাসনাধীন করে সেটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করা। এই সময় থেকে একটিই স্কুল থাকল – 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়'। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারি থেকে এই উভয় পরিবর্তনই কার্যকর করা হল। এর অনেক আগেই ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে জুন বিষ্ণু মহারাজ স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ থেকে অবসর নেন এবং ১ জুলাই থেকে হেডমাষ্টার হয়ে আসেন ব্রম্ভচারী গিরিশ চৈতন্য (স্বামী প্রভানন্দ)। আরও আগেই স্কুলকে একটি সর্বভারতীয় রূপদানের উদ্দেশ্যে একটি ইংরেজী মাধ্যম সেকশানও খোলা হল যাতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্ররা এই স্কুলে এসে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। সেই বছর থেকেই ইংরাজী ও বাংলা উভয় মাধ্যমে দুটি সমান্তরাল শাখায় স্কুল চলতে থাকে কিন্তু প্রথম থেকেই বাংলা মাধ্যমে দুটি সমান্তরাল শাখায় স্কুল চলতে থাকে। কিন্তু প্রথম থেকেই বাংলা মাধ্যম স্কুলেও যাতে ছেলেরা ভাল ইংরাজী শিখতে পারে সেজন্য মহারাজের সবসময় সজাগ চিন্তা ছিল। ইংরাজী ভাষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর

অনুরাগ। এই ভাষায় তাঁর ছিল সীমাহীন জ্ঞান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজের বক্তৃতা শুনে তথাকার অধ্যাপকরা বলেছিলেন – Swamiji ! You speak impeccable English. মহারাজের বাচনভঙ্গী এবং লেখার স্টাইল ছিল অননুকরনীয়। স্কুলের ছেলেদের ভাল ইংরাজী শেখাবার জন্য মহারাজের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। তাই তিনি স্কুলে ইংরাজী পড়ানোর জন্য বাইরে থেকে ভালো ভালো অভিজ্ঞ বয়স্ক সব শিক্ষক এনেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রেমাংশু কুমার সেনগুপ্ত, সারদাপ্রসাদ দে, অক্ষয়কুমার দে এবং সুধীন্দ্রনাথ বর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের দৃষ্টি কেবল দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর দৃষ্টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের কথা পৃথিবীর লোক জানুক। তাই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষক আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। V.S.O (volunteer service overseas) এর পক্ষ থেকে আয়ারল্যান্ড থেকে এলেন Simon Me Kormick, আমেরিকার peace crop এর volunteer এলেন Roger Wicklander এবং Mike Maidenberg, ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন Christopher J. Stocks . V.S.O -র তরফ থেকে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন ক্রিস্টোফার গেস্ট; এঁদের পরে এলেন V.S.O – র পক্ষ থেকে বি. ডেভিড রজার হিলন এবং মি. উইলিয়াম ফ্রান্সিস, মার্টিন কলিন্স। এই সমস্ত শিক্ষকরা প্রধানত দু'বছরের চুক্তিতে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। ছাত্রদের কাছে এঁরা কেউ বা মার্টিন দা, ডেভিড দা, মাইক দা হয়ে উঠেছিলেন।[৪] এইসমস্ত শিক্ষকরা প্রধানত ষাট ও সত্তরের দশকে এসেছিলেন। স্কুলের ছেলেদের ভাল ইংরাজী শেখাবার আগ্রহ মহারাজের মধ্যে কত তীব্র ছিল তা একটি ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যাবে। স্কুলের দ্বিতীয় বছরেই (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি কয়েকজন শিক্ষককে ইংরাজী শেখাবার ট্রেনিং নেবার জন্য হায়দ্রাবাদের Institunte of English – এ চারমাসের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

বস্তুতপক্ষে, নরেন্দ্রপুর স্কুলে প্রথম থেকেই সব বিষয় পড়াবার জন্য নামী বিদগ্ধ সব শিক্ষকরা এসেছিলেন এবং পঠন-পাঠনের মানও সবসময় উচ্চমানের। বিভিন্ন বিষয়ের কৃতী এবং দুর্লভ পান্ডিত্যের অধিকারী এইসব শিক্ষকের জন্যই এই কঠিন কাজটি সম্ভব হয়েছিল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। নরেন্দ্রপুরের প্রাণপুরুষ ও রূপকার স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে নরেন্দ্রপুরকে আপন কর্মদক্ষতায়। প্রতিভায় তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন। তিলে তিলে তিলোত্তমা নির্মাণ করলেন। কিন্তু সেই বড়ো মহারাজকে ১৯৭৩ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর অকস্মাৎ মঠের নির্দেশে তাঁর প্রানপ্রিয় তাঁর মানসসন্তান নরেন্দ্রপুর পরিত্যাগ করে গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহন করতে হল।

## ২.৩ নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়ার সেকেন্ডারী মাল্টী পারপাস স্কুল চালু হয়ে গেছে এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেই স্কুলে একাদশ শ্রেনী পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তার পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি ঘটে গেছে। এরপর ১৯৬০ সালের শুরুতেই আরম্ভ হয়ে গেল নরেন্দ্রপুরে ডিগ্রি কলেজ গড়ে তোলার কাজ। মহারাজ এই কাজের দায়িত্ব দিলেন আশ্রমেরই ছাত্র বিকাশচন্দ্র সান্ন্যালের ওপর। শ্রী সান্ন্যাল তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এসসি (স্ট্যাটিটিকস্) পরীক্ষা দিয়ে ফল বেরোনোর অপেক্ষা করছিল এবং কোথাও চাকরি নেবার চিন্তা চাকরি নেবার চিন্তাভাবনা করছিল। সেই সময় ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে মহারাজ একদিন বিকাশ সান্ন্যালকে ডেকে আশ্রমে ডিগ্রি কলেজ গড়ে তোলার দায়িত্বভার দিলেন। এর কিছুদিন আগে কলেজ তৈরীর জন্য বেলুড় থেকে আশা পেয়েছিলেন মহারাজ। তিন বছরের নতুন ডিগ্রি কোর্সও চালু হল ওই সময় (জুলাই মাস) থেকে। এই কলেজে শুধুমাত্র অনার্সের ছাত্ররাই পড়তে পারবে। এরকম একটা নতুন কলেজের জন্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকাঠামো। ভালো লাইব্রেরী, বিদগ্ধ শিক্ষামন্ডলী এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সুসজ্জিত ল্যাবরেটারী। সে সময়ে নরেন্দ্রপুরে এর কোনোটাই ছিল না কিন্তু সময় পেলে সবই ধীরে ধীরে তৈরী হতে পারে। উপযুক্ত ঘরবাড়ী এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরী করে নেওয়ার সামর্থ্যও আশ্রমের ছিল কিন্তু সমস্যা ছিল অন্যদিকে সেটা হল বিভিন্ন বিষয়ে অর্নাস পড়াবার মতো একদল যোগ্য শিক্ষক জোগাড় করা এবং উপযুক্ত ল্যাবরেটরী গড়ে তোলা। নরেন্দ্রপুর কলেজেকে স্বীকৃতি দানের জন্য ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকমন্ডলী এলেন, এঁরা ছিলেন অধ্যাপক সরোজ কুমার বসু কলা বিভাগের জন্য, বিজ্ঞান বিষয়সমূহের বিশেষজ্ঞরূপে এলেন অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং দলপতি হিসাবে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কলেজ সমূহের পরিদর্শক ডঃ এ. পি. দাশগুপ্ত। এই পরিদর্শক দলটি কিন্তু এককথায় জুলাই মাসে কলেজটি আরম্ভ করার স্বীকৃতি দিলেন না; কোনোরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়েই দলটি সেদিন নরেন্দ্রপুর ত্যাগ করেছিল, যদিও তার অনেক কারণ ছিল। কলাবিভাগেরগুলিতে অনার্স কোর্স চালু করায় তেমন অসুবিধা না হলেও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় অনার্স পড়াবার জন্য একদিকে যেমন অভিজ্ঞ ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন একদল শিক্ষকের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দামী, সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি সহিত আধুনিক ল্যাবরেটারী। এর কোনোটাই তখন নরেন্দ্রপুরে ছিল না। মহারাজ তাঁদের কাছে কিছু সময় চাইলেন এবং তাঁদের কাছে অভিমত জানালেন যে প্রথম বছরের ক্লাস চালাবার মত পরীক্ষাগার তৈরী করতে আশ্রম সক্ষম এবং কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষকও পাওয়া যাবে পড়াবার জন্য। এরপর শ্রী সান্ন্যাল কাজে নেমে পড়লেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সব কাজ গুছিয়ে ফেলে কর্মদক্ষতার এক দুর্লভ নজীর সৃষ্টি করল। শ্রী সান্যাল প্রথমে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে

দেখা করল এবং তাঁর সহযোগিতায় স্কটিশচার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যার তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক কৃষ্ণপদ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করল। কৃষ্ণপদ ঘোষ ক্যাম্পাস দেখে এবং মহারাজের সঙ্গে কথা বলে খুব প্রীত হয়েছিলেন এবং নরেন্দ্রপুরের নতুন কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। এরপর শ্রী সান্যালের চেষ্টায় একদিন স্কটিশচার্চ কলেজের রসায়নবিভাগের দু'জন সিনিয়র স্বনামধন্য অধ্যাপক, নরেন্দ্রপুরে এসে মহারাজের সঙ্গে কথা বললেন। এর ফলস্বরূপ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিজ্ঞান পরিচালনায় জন্য দু'জন বরিষ্ঠ অধ্যাপককে পাওয়া গেল এবং আরও কয়েকজন উপযুক্ত অধ্যাপক এবং কর্মীকেও পাওয়া গেল। এঁরা পরীক্ষাগার গড়ে তোলার দায়িত্বও নিজেদের ওপর তুলে নিলেন। ল্যাবরেটারী সাজাবার জন্য উত্তম যন্ত্রপাতি তৈরী করার উপযুক্ত দু-একটি কারখানার সন্ধান কলকাতাতেই পাওয়া গেল এবং ভাবী অধ্যাপকদের তৈরী নক্সা অনুযায়ী তারা কিছু কিছু যন্ত্রপাতী তৈরী করে দিলেন। অন্যদিকে ইংরাজী বিভাগের প্রধানরূপে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে এলেন অধ্যাপক সৌরীন্দ্রলাল মিত্র। গনিত বিভাগের প্রধানরূপে পাওয়া গেল সরকারী কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গোবিন্দদেব ভট্টাচার্যকে। এইভাবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক বাধাগুলি অতিক্রম করে কলেজটি মহারাজের নেতৃত্বে এবং শ্রী সান্যালের নিরলস প্রচেষ্টায় দ্রুত গড়ে ওঠে।[৫]

জুলাই মাসে কলেজটি শুরু করার বন্দোবস্ত শুরু হতে লাগল এবং অর্থ সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় পুর্নবাসন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। এটি হবে একটি সরকার অনুমোদিত কলেজ এবং এখানে সরকারের অনুমোদন দরকার। কলেজের নিজস্ব বাড়ী তখনও হয়নি, মাত্র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। কিন্তু সেই

বাড়ী তৈরী হতে দু'বছর সময় লাগবে সেইজন্য প্রথম বছর কলেজের যাবতীয় ক্লাস শুরু হয় স্কুল বাড়ীর দক্ষিনদিকের অংশে। কলেজের প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্র আশ্রমেই কুবের মহারাজের তত্ত্বাবধানে দ্রুতগতিতে তৈরী হতে লাগল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে মে রেজিষ্টারের লেখা চিঠিতে কলেজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেল। এর পরবর্তী দু'মাস সময়ের মধ্যে কলেজ শুরুর যাবতীয় বাকি কাজ দ্রুতগতিতে হতে লাগল। এইসব কাজের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল সরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রয়োজনীয় কতগুলি কাজ, অপরদিকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র দিয়ে ল্যাবরেটারী ও ক্লাসরুমগুলো সাজানো, লাইব্রেরীতে সাধ্যমত প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করা এবং প্রতি বিষয়ে অনার্স ক্লাস নেবার মতো উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে বার করা এবং নিয়ম মেনে তাদের নিয়োগ করা। কলেজে তখন মোট সাতটি বিষয়ে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা করা হল। বিষয়গুলি হল – পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, ইংরাজী, ইতিহাস এবং অর্থনীতি এছাড়া পাসকোর্সে থাকল বাংলা, সংস্কৃত, এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এভাবে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রপুরে শুরু হল রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়্যাল কলেজ, সেটি সম্পূর্ন এক নতুন ধরনের কলেজ যেখানে প্রথম বছর থেকেই শুধুমাত্র অনার্স ক্লাসেই ছাত্র ভর্তি করা হতে থাকল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন কেউ নিযুক্ত হয়নি। প্রিন্সিপ্যালের কাজ চালাবার জন্য শ্রী বিকাশচন্দ্র সান্যালকে Professor in charge নিযুক্ত করা হল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট প্রথমবর্ষের মোট ৬০ জন ছাত্র নিয়ে কলেজের জয়যাত্রা শুরু হল। তখন কলেজের নিজস্ব বাড়ী যেমন ছিল না অধ্যাপক শিক্ষকদের থাকার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা। তখন নতুন নতুন শিক্ষক ও কর্মী আসছেন কলেজে এবং স্কুলেও। আচার্যপল্লীতে গৃহ নির্মাণ কাজ সদ্য শুরু হয়েছে, শেষ হতে অনেক দেরী। এমতাবস্থায় নবাগত শিক্ষক – অধ্যাপকদের থাকার জন্য স্কুলের ছাত্র জন্য নবনির্মিত শিবানন্দ

ভবনের ব্যবস্থা করা হল। শিবানন্দ ভবন কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এটি ছিল একটি অল্পদিনের প্রকল্প, বাড়ীটি ছিল স্কুলের হস্টেল। তাই প্রয়োজন ছেড়ে দিতে হবে। পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে আচার্যপল্লীতে একটি দুটি কোয়ার্টার থাকবার মত তৈরী হয়ে গেছে, তখন বাইরে থেকে আসা অধ্যাপকরা মেস ছেড়ে সেখানে চলে যেতে লাগলেন।

প্রথম বছর কলেজ ছিল প্রতি বিষয়ে একটি করে ক্লাস, সাতটি বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং তিনটি বিষয়ে পাস কোর্স। মোট ছাত্রসংখ্যা ষাট এবং শিক্ষকের সংখ্যা একুশ। পরবর্তী দু'বছরে প্রতি বিষয়ে একটি করে ক্লাস বেড়েছে, ছাত্র বেড়েছে, নতুন নতুন শিক্ষক এসেছেন, স্কুলবাড়ীতে জায়গা করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না ফলে নতুন কলেজ ভবনে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা জুলাই থেকে কলেজের যাবতীয় অফিস এবং বিভাগগুলিকে সরিয়ে নেয়া হল। ততদিনে বিজ্ঞান বিষয়ের ল্যাবরেটারীগুলো প্রাথমিকভাবে মোটামুটি তৈরী হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিষয়ের নতুন নতুন বই সংগ্রহ করে একদিকে যেমন সেন্ট্রাল লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি আবার প্রতি বিষয়ের জন্য বিভাগীয় লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছে প্রতি বিভাগে আলাদা করে। বিভাগীয় লাইব্রেরীগুলি দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত সেই বিভাগের একজন অধ্যাপকের ওপরে। যেটুকু জানা যায়, বেশকিছু বই আসত Asian Book House. ওই রাস্তায়ই আর একটু এগিয়ে ছিল Patrika – Jugantar থেকে। সেখান থেকে পাঠ্য বিষয় এবং বিষয় বর্হির্ভূত অনেক ভালো বই অনেক ভালো বই আসত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলেজ দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্ররা এসেছিল। কলেজ তখন নিজস্ব নতুন ভবনে চলে এসেছে। ঐ বছরই আশ্রমের হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা পাশ করে বেরিয়ে এরা অনেকে ভর্তি হল, এছাড়াও বাইরের ছাত্ররা তো যথানিয়মেই এল। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রদের নিয়ে কলেজ পূর্ণতা পেল। কলেজে যখন তিন বছরে পরিপূর্ন

(১৯৬২) ততদিনে অনেক শিক্ষক এসেছেন, আবার অনেকে চলেও গিয়েছেন অল্পদিন কাজ করে। নরেন্দ্রপুর তখন এক মহামিলন ক্ষেত্র, বিদ্যাচর্চার এক পীঠস্থান।

প্রথম দু'বছরে কলেজ পরিচালনায় দায়িত্ব ছিল বিকাশ সান্যালের ওপর। সে ছিল Professor-in-charge- অতিশয় নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সঙ্গে বিকাশ সান্যাল এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন দু'বছর। ঐ সময়ের মধ্যে কলেজ সবদিক থেকেই দাঁড়িয়ে গেছে। যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী, ভাল ছাত্র, সুদৃঢ় পরিকাঠামো। কিন্তু নিয়ম মেনে কলেজের প্রিন্সিপাল হবেন একজন সাধু- সেই লক্ষ্যে রঞ্জন মহারাজ (স্বামী মুমুক্ষানন্দ) ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এম.এ পাশ করলেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই রঞ্জন দা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। ৩০ শে জুন পর্যন্ত বিকাশ সান্যাল Professor-in-charge এর দায়িত্ব পালন করেন। ১লা জুলাই ছিল পশ্চিমবঙ্গে একটি শোকদিবস ছিল। এদিন দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয়। এরপর রঞ্জন মহারাজ প্রায় বারো বছর থাকেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে ছিলেন। তাঁর কার্যকালে নরেন্দ্রপুর কলেজ সারাদেশের এক আদর্শ কলেজ রূপে খ্যাতিলাভ করে। নরেন্দ্রপুর কলেজ প্রথম থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে চমকপ্রদ ফল করতে থাকে। কলেজ থেকে প্রথম ব্যাচ পরীক্ষা দেয় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সে বছর শতকরা ৯৮ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে এরকম উচ্চমান অব্যাহত থাকে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অনার্স পরীক্ষায় গনিত এবং রসায়নে নরেন্দ্রপুরের ছাত্ররা প্রথম শ্রেনীর প্রথম স্থান অধিকার করে। পরবর্তী বছরগুলিতে পরীক্ষায় এরকম সাফল্যের ধারা বজায় থাকে। শুধু পড়াশোনায় নয়, অন্যান্য বিষয়েও- বিতর্ক, বক্তৃতা, খেলাধূলা, সেবামূলক কাজ ইত্যাদিতেও ছেলেরা যাতে পারদর্শী হয়ে ওঠে, সেজন্য কলেজে সবরকম ব্যবস্থা করা হল। তবে মহারাজের স্বপ্ন- এখান থেকে যারা

বেরোবে তারা হবে complete man. কলেজে শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ, ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কও ছিল আদর্শ। ছাত্ররা প্রায় সবই ছিল যথেষ্ট উচ্চমানের সেজন্য বিভিন্ন গল্প আলোচনা। সেমিনার লেগেই থাকত। প্রথম থেকেই নরেন্দ্রপুর কলেজে বহু বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের বড় অফিসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশিষ্ট সব জ্ঞানীগুনী, শিক্ষাব্রতী, বিদেশী নানা অতিথি – ছাত্র, অধ্যাপক এবং অন্যান্য ভিজিটররা – এসব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই মহারাজ উপস্থিত থাকতেন। নরেন্দ্রপুর কলেজের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই কলকাতার বিখ্যাত কলেজগুলি থেকে অতিথি লেকচারাররা আসতেন লেকচার দিতে বিভিন্ন বিষয়ে। তাঁদের কয়েকজন হলেন – ডঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, প্রফেসর মুরারীমোহন রায়চৌধুরী, প্রফেসর অনিলকুমার ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। এ প্রসঙ্গে ডঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন নিরলস পরিশ্রম করেছেন পড়িয়েছেন এবং প্রথমদিকে রসায়নের ল্যাবরেটারী গড়ে তুলবার জন্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছেন। আজীবন তিনি কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কলেজ পরিচালনা কমিটির অধ্যক্ষের কাজ করেছেন।[৬]

## ২.৪ নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠাঃ

কলেজ শুরুর পরপরই তৈরী হল অন্ধদের বিদ্যালয়। এই অন্ধ বিদ্যালয়ের ইতিহাসটি বেশ মজার। লোকেশ্বরানন্দজী যখন পাথুরিয়াঘাটায় তখন একদিন একটি চিঠি এল তাঁর কাছে। তাতে লেখা "আমি একজন দরিদ্র ছাত্র! আমি শুধু দরিদ্রই নই, আমি অসহায়ও। এই অর্থে অসহায় যে,

আমি অন্ধ। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি, আপনাদের ওখানে অনেক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে বিনাখরচে রাখেন এবং তারা ওখানে থেকে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে। আমি দরিদ্র তো নিশ্চয়ই, তবে মেধাবী কিনা জানি না। তবে আমি ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলাম। একটা বিষয়ে 'লেটার' ও পেয়েছিলাম। আমি এবার ইন্টারমিডিয়েট দিয়েছি – এখনও ফল বেরোয়নি। আমি বি.এ পড়তে চাই। আমাকে যদি দয়া করে আপনাদের ওখানে রাখেন তাহলে আমার পড়াটা হয়। আপনারা আমাকে বিনা খরচে থাকবার সুযোগ না দিলে আমার পক্ষে আর পড়াশুনো করা সম্ভব হবে না"। চিঠিটা পেয়ে লোকেশ্বরানন্দজী তাকে একদিন দেখা করতে বললেন। বাবার সঙ্গে ছেলেটি এল। নাম ভবানীপ্রসাদ চন্দ। লোকেশ্বরানন্দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে যে ছাত্রাবাস থাকবে ঘর রান্নাঘর এসব চিনবে কি করে ? ট্রামে বাসে চড়ে কলেজে কীভাবে যাবে ? রাস্তাঘাটই বা চিনবে কি করে ? সে উত্তর দিলঃ 'আমাকে শুধু একবার কোন্ ঘরে থাকব, খাবার ঘর কোথায়, কোথায় উপাসনা হয় প্রভৃতি যদি দেখিয়ে দেন আর কলেজ যেদিন প্রথম যাব সেদিন যদি কেউ আমাকে সঙ্গে করে কলেজে নিয়ে যায় তাহলে তারপর থেকে আমি নিজেই সব করতে পারব, কারুর সাহায্য দরকার হবে না'। তাঁর কথা শুনে লোকেশ্বরানন্দজী অবাক হয়ে গেলেন। তারপর অন্ধ ছেলেটি বলল 'আমি আই. এ. তে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করব। তবে তার বেশি কিছু হবে না, ' যখন ইন্টারমিডিয়েটের ফল বেরোল, তখন মহারাজ গেজেটে দেখলেন যে, অন্ধ ছেলেটি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। মহারাজ তাকে চলে আসার জন্য টেলিগ্রাম করলেন। সে এল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল।[৭] ভবানীপ্রসাদের পর থেকে আরও অনেক অন্ধ ছেলে খোঁজ –খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুরে যোগাযোগ করতে শুরু করল এবং আরও অনেক অন্ধ ছেলে নরেন্দ্রপুরে এসে ভর্তিও হল। এইভাবে অন্ধ

ছেলেদের জন্যই একটি আলাদা ছাত্রাবাস করার প্রয়োজন বলে মনে হল এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নরেন্দ্রপুরে 'ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। আর ভবানীপ্রসাদ চন্দ তখন এম.এ পাশ করেছে এবং সে হল এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ। লোকেশ্বরানন্দজীর মতে, - "খুব কম লোকই অনুমান করতে পারে প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করা কতটা কঠিন। এটা সত্যি যে, যেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে সেখানে কোনো একরকম মানসিক অসুস্থতাও থাকে। শরীর ও মন এত গভীরভাবে যুক্ত যে যেখানে একটি ক্ষতি হলেও অন্যটিও তার ফল ভোগ করে। তুমি যদি কোনো বাচ্চাকে সাহায্য করার চেষ্টা করো যে শারীরিকভাবে অক্ষম তার ফল ভোগ করে। তুমি যদি কোনো বাচ্ছাকে সাহায্য করার চেষ্টা করো যে শারীরিকভাবে অক্ষম তার মনটাকেও পড়া খুব গুরুত্বপূর্ন। কারন তার ব্যক্তিত্ব তার শরীর ও মন দুটোর উপরই নির্ভর করে। যদি তার মনকে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে তার শারীরিক কার্যক্ষমতাকে উন্নীত করার চেষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ হয়তো এমন হবে যে, তার শারীরিক বিকাশ সত্ত্বেও তার মনে আত্মবিশ্বাস নেই, যার ফলে সে নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করে। শিক্ষায় প্রবেশ একটা অন্ধ ছাত্রের মানসিক প্রশিক্ষণ – এ গুরুত্ব দেয়। যে মুহূর্তে ছাত্ররা শিক্ষায় প্রবেশ করে তখনই তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ও অক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। কোনো পরিমাপেই তখন পূর্ণ সিদ্ধান্ত নয় কারন যত সময় যায় একটা অন্ধ ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটে। তখন ছাত্ররা তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পায়। অন্ধত্ব একটা বড়ো অপূর্ণতা কিন্তু যদি একটা কঠিন কাজ করতে পারে এবং বুদ্ধিমান হয় , তাহলে তার সেই অপূর্ণতা পূর্ণ হতে পারে এবং যারা দেখতে পায় তাদের সাথেও প্রতিযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এরজন্য জরুরী হল আত্মবিশ্বাস, যেটা সঠিক প্রশিক্ষণের ফলে

তারা পায়। যে কোনো প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আত্মবিশ্বাস দেওয়া। এইভাবে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি আরেক জন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। এবং এভাবেই শিক্ষা, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং একটি প্রতিষ্ঠান সফলতা পায়"।

ভারতে বৃহৎ ভাবে অন্ধদের উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করে রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৫৭ সালে। যদিও ১৮৮০ সালে অন্ধদের জন্য প্রথম একটি স্কুল খোলা হয়েছিল অমৃতসরে ক্রিশ্চান মিশনারীর দ্বারা। বাংলায় সেরকম একটি স্কুল প্রথম তৈরী করেন লাল বিহারী শাহ। এখানে শুধুমাত্র বড়ো লোকের ছেলেরাই পড়াশোনা করতে পারত এবং এটি মাধ্যমিক পর্যন্ত ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে অন্ধদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান খুবই কমই ছিল। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বেশ কিছু অন্ধ ছাত্রদের উন্নতির জন্য ভেবেছিলেন কিন্তু টাকার অভাবে করতে পারছিলেন না। এসময় ডি.এম.সেন (পশ্চিমবঙ্গের D.P.I) মহারাজকে বললেন অন্ধ ছেলেদের জন্য একটা Unit তৈরী হোক যেটাতে সরকার সাহায্য করবে। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্ধ শিশুদের জন্য একটি বাড়ী তৈরী হল। তখন শুধু ৯টি ছাত্র ছিল। একজন সুপারেনটেনডেন্ট ও একজন ইনস্ট্রাকটার ছিল। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ তে এই ছাত্রাবাসটি বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে এই নরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত করা হল যার নাম হল "রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড  বয়েজ একাডেমি"। প্রথমে ক্লাস হত ব্রহ্মানন্দ ভবনে তারপর আশ্রমের বিদ্যালয় হলে, এরপরও কিছুদিন বিজ্ঞানানন্দ ভবনে ক্লাস হয়েছে। ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমি তৈরী হওয়ার পর ক্যাম্পাসেই ক্লাস হতে শুরু করে। একাডেমি শুরুর কয়েক বছরে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট) তিনি অন্ধ ছাত্রদের দেখাশোনা করতেন। তাঁর অসুস্থতার জন্য তিনি বেশিদিন এইকাজ করতে পারেননি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার ব্লাইন্ড বয়েজ  অ্যাকাডেমি নবম শ্রেনী থেকে উপরের পড়াশোনার জন্য নতুন একটি পরিবর্তিত মাধ্যম আনল। যার নাম "কোঅপারেটিভ এডুকেশন"। অষ্টম শ্রেনীর ছাত্ররা একাডেমিতে পড়ার পর তাদেরকে রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপাস স্কুলে পাঠানো হওয়া আরম্ভ হল। সেখানে তারা কিছু 'semi Blind' ছেলেদের সাথে মিলেমিশে পড়তে শুরু করল এবং তাদের সাহায্যের জন্য ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি সবরকম সাহায্য করল। বাইরে গিয়ে পরীক্ষাতেও অন্ধ ছাত্ররা ভালো ফল করল। ১৯৭৬ সালে 'হিউম্যানিটিস' এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি অন্ধ ছাত্র ষষ্ঠ স্থান অধিকার করল এবং  আশ্রম বিদ্যালয়ে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল তখন সেখানেও অন্ধ ছাত্ররা 'First division' এবং 'Star marks' পেল। ১৯৮৭ সালে অ্যাকাডেমি WBBSE – এর সাথে যুক্ত হল। এরপর উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোও শুরু হয়ে গেল। তখন রাজ্য সরকার এই সম্পূর্ন শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হল। অনেক স্কুলে প্রাথমিক স্তরেও এই শিক্ষার কাঠামো আনা হয়েছিল। ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি'র দ্বারা এই যে ধরনের শিক্ষার মডেলটা আনা হয়েছিল, তা সরকারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৮]

আমেরিকার একটি সংস্থা Vocational Rehabilitation Administration – এর সাহায্য নিয়ে ১৯৬৪ তে ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি একটি কার্যক্রম শুরু করে যেখানে অন্ধ ছাত্রদের শক্তির সাহায্যে চালিত যন্ত্র যেমন – লোহা কাটা মেশিন, তার গোটানোর যন্ত্র, গর্ত করার যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার শেখানো শুরু হল। ১৯৬৯ স্বালে এই পরিকল্পনার আর্থিক দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিল। অন্ধদের শিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বানানোর জন্য ১৯৬৫ সালে 'National institution for the visually handicap deradun' যেটা কেন্দ্রীয় সরকার চালিত প্রতিষ্ঠান। যার অর্থনৈতিক সাহায্যে অ্যাকাডেমিতে একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করা হল। এই প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রে শুরুর দিকে শুধু পুরুষরাই নিয়োগ হতে পারত বা যোগ দিতে পারত। তারপর মহিলারাও এই প্রশিক্ষন কেন্দ্রে যোগ দিতে পারত,এমনকি কিছু বছর পর দক্ষিন ভারত, পূর্ব ভারত এবং উত্তর পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশ থেকেও শিক্ষকরা আসতে শুরু করল। ১৯৬৭ সালে নরেন্দ্রপুরে 'রিজিওনাল ব্রেইল প্রেস' প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেখানে ব্রেইল বই ছাপানো হল। অসমিয়া, বাংলা, ইংরেজী, মনিপুরী, উড়িষা এবং সংস্কৃত এই ৬ টি ভাষায় ব্রেল বই ছাপানো শুরু হল। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিক বিশেষ দেখভাল করত। অন্ধ যুবকরা যারা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কাজ পেত না বা যাঁদের কারখানা থেকে সাময়িক সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত, এদের জন্য ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমি ১৯৬৭ সালে একটি অস্থায়ী চুক্তিবদ্ধ কার কারখানা তৈরী করল। অন্ধ কর্মীরা এই কারখানায়, অন্ধদের লাঠি, মশলা গুঁড়ো ইত্যাদি তৈরী করতে শুরু করল।

১৯৭৩ সালে অ্যাকাডেমি অন্ধ ছাত্রদের কৃষি ও পশুপালন বিদ্যা শেখানোর জন্য একটি প্রকল্প শুরু করল। যে ছাত্ররা গ্রাম থেকে আসত। তাদের কে সব্জি বাগান, গরু রাখা, পোলট্রির কাজ, ছাগল- ভেড়া পালন শেখানো হল। ১৯৯৩ সালে অ্যাকাডেমি সম্প্রদায় ভিত্তিক পুর্নবাসন এর একটি অত্যাধুনিক প্রকল্পের ধারনা আনল। এই প্রকল্পের জন্য দক্ষিন চব্বিশ পরগনা এবং হাওড়া জেলার কিছু অঞ্চলকে এই পরিকল্পনার জন্য ঠিক করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী লোকজনকে পরিচয় পত্র করা হল এবং তাদের সমাজে পুর্নবাসনের জন্য ও আর্থিক, স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল। অ্যাকাডেমির শেষ এবং সেরা কৃতিত্ব হল অ্যাকাডেমি উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তার ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষন দেওয়া এবং আরোগ্যকারীর সেবাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়ার সুব্যবস্থা তৈরী করেছিল।

## ২.৫ নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাঃ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী প্রতিষ্ঠিত লোকশিক্ষা পরিষদ ইতিহাসের পাতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। লোকশিক্ষা একটি গনশিক্ষার আন্দোলন – তার জন্য প্রয়োজন গনচেতনা সৃষ্টি এবং সেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে ধারাবাহিকভাবে। দ্বিতীয়তঃ ধারাবাহিকভাবে তা চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন স্থানীয় ভিত্তিক স্থানীয় মানুষের দ্বারাই পরিচালিত সংগঠক। তৃতীয়তঃ সংগঠন চালাবার জন্য আবার প্রয়োজন ব্যাপক গনশিক্ষার। এই গনশিক্ষার মধ্যে থাকবে নেতৃত্ব বিকাশের শিক্ষা, তেমনি থাকবে বহুমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা। চতুর্থতঃ এই শিক্ষা কর্মসূচী কোন একটি স্থায়ী শিক্ষা কর্মসূচী নয়। এগুলো হবে স্থানীয় ভিত্তিক ও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী। স্থানীয় প্রয়োজন ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এগুলো পরিবর্তন করতে হবে এবং নতুন নতুন কর্মসূচী নিতে হবে। পঞ্চমতঃ এই শিক্ষা কর্মসূচী হবে ব্যাপক যাকে আজকাল আমরা মানব সম্পদ উন্নয়ন বা Human Resource Development অ্যাখ্যা দিয়ে থাকি। এতে একদিন থাকবে বহুমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আবার অন্যদিকে এর অর্ন্তগত থাকবে সাধারন শিক্ষা ব্যবস্থা। ষষ্ঠতঃ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই শিক্ষার দ্বার খোলা থাকবে। সপ্তমতঃ এই শিক্ষা যে শুধুমাত্র তৃনমূল স্তরেই হবে তা নয়, মানুষের ক্রমাগত অভিজ্ঞতার নিরিখে ধীরে ধীরে ওপরের স্তরেও শিক্ষা সঞ্চারের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান যুগের পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে গ্রামের কাজের জন্য গ্রামের অভিজ্ঞ মানুষদের নিয়ে কর্মীদল সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। অষ্টমতঃ এই ধারা বজায় রাখতে গেলে কেন্দ্রীয় স্তরে একটি মূল্যায়ন ও গবেষনা কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। একদিকে লোকেশ্বরানন্দজী যেমন সাধারন কর্মীদের ওপর কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন, তেমনি আবার চাইতেন তারা যেন ধারাবাহিক ভাবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের

ক্রমশঃ আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় স্তরে এমন একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যার কর্মীরা একদিকে যেমন গ্রামের কর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের সমস্যা বুঝে সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারেন, অপরদিকে তাঁরা স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রানিত হয়ে আর্দশগতভাবে গ্রামের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অর্থাৎ একদিকে তাঁদের দক্ষ প্রযুক্তিবিদ হতে হবে, অপরদিকে তাঁদের চলন – বলন কথাবার্তা সাধারন মানুষের মধ্যে গঠনমূলক উদ্দীপনা সৃষ্টির উপযুক্ত হতে হবে। তাঁরা মূলত হবেন সাহায্যকারী, ভুল ধরা তাঁদের লক্ষ্য হবে না। লোকশিক্ষা পরিষদ সৃষ্টির পশ্চাতে যে মূলচিন্তাগুলি কাজ  করেছে তা যদি আমরা না বুঝতে পারি, তাহলে এই শিক্ষা আন্দোলন কখনোই সার্থকভাবে রূপায়ন করা যাবে না। আর এখানেই স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কৃতিত্ব। নরেন্দ্রপুর স্বামী লোকেশ্বরানন্দের একটি অনন্য সৃষ্টি, যা আমি আগেই বলেছি , এবিষয়ে সকলেই জানে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যেমন নরেন্দ্রপুরে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে। তেমনি রয়েছে লোকশিক্ষা পরিষদ। যেসব চিন্তাভাবনা নিয়ে এবং যে পদ্ধতিতে এই কর্মসূচী রূপায়নে করা হচ্ছে তার তুলনা সারা দেশে তো বটেই, পৃথিবীর বহুদেশে মেলা ভার। অবশ্য এইসঙ্গে আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীদেরও অবদান আছে। তাঁরা হলেন স্বামী অসক্তানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ, স্বামী অক্ষরানন্দ এবং স্বামী উমানন্দ। লোকশিক্ষা পরিষদ –এর কর্মীরা স্বামী লোকেশ্বরানন্দের চিন্তাভাবনা অনুসরন করে লোকশিক্ষা পরিষদকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, মূলনীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের চিন্তাভাবনাই প্রধানত কাজ করেছে ।[৯] আবার স্বামী লোকেশ্বরানন্দের চিন্তাভাবনা মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সাধারণ মানুষের জন্য যে সব নীতি ও নির্দেশিকা – তারই ফলপ্রসু অনুসরণ মাত্র। অনেক সময় মহাত্মা পুরুষদের চিন্তাভাবনা সাধারন

মানুষের বোধগম্য হয় না, যদি সেই চিন্তা ভাবনা গুলো উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয় তবেই তা সার্থক। স্বামী লোকেশ্বেরানন্দ মূলত সেই কাজটি করেছিলেন।

উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাই অবহেলিত সাধারন মানুষের উন্নতির একমাত্র উপায়। আবার সেইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, সে শিক্ষা তথাকথিত বিধিবদ্ধ শিক্ষা নয়। এ এমন শিক্ষা যার মাধ্যমে একজন কৃষক ভালো কৃষক হতে পারবে। একজন জেলে ভালো হতে পারবে, একজন ছুতোর মিস্ত্রী এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের আরও উন্নতি করতে পারবে। লোকেশ্বরানন্দজী তাঁর লোকশিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনার প্রথম প্রয়োগ হয় ১৯৫২ সালে রামবাগান বস্তি উন্নয়নের মধ্য দিয়ে রামবাগান বস্তির মানুষদের একটা বড়ো অংশইহাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন – যেমন বাঁশ এ বেতের কাজ, সানাই ইত্যাদি গান বাজনার কাজ, প্রিন্টিং এর কাজ ইত্যাদি।[১০] এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে উন্নত ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্তির মানুষদের উপযোগী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা একসঙ্গে শুরু করা হল। এই প্রচেষ্টা আশ্চর্যজনকভাবে সফল হয়েছিল। পূজনীয় মহারাজ প্রথম থেকেই ছেলে ও মেয়ে উভয়ের শিক্ষার উপর জোর দিতেন। বরং বলা যায় যে শিক্ষা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েরাই বেশী গুরুত্ব পেয়ে আসছে। এসব কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে সংগঠন আছে। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা মহিলা সংগঠন তৈরী হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে রেখে তিনি প্রায়ই বলতেন- ছেলে ও মেয়েদের সমান ভাবে উন্নতি না হলে কখনোই উন্নয়ন বেশী দূর এগোতে পারবে না। এই কাজের ধারা রামবাগান বস্তিতে পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে আজও অব্যাহত আছে। অনেক জায়গায় এই কাজটি ‘সুসংহত শিশু বিকাশ’ কর্মসূচীর

মাধ্যমে শুধু শিশু নয়, তাদের পরিবারের এবং সামগ্রিকভাবে গ্রামীন সুস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রামবাগান বস্তিতে বয়স্ক শিক্ষাদান কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীকালে এই কাজের ধারা পশ্চিমবঙ্গের এগারোটি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্তমানে লোকশিক্ষা পরিষদ বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। তিনি প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি ছাত্র গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। কোথাও আবার কোন ছাত্র সংগঠনকে তৈরী করে তাদের মাধ্যমে কাজ করাতেন। এইসময়ে রামবাগান বস্তিতেও 'জনকল্যান সমিতি' নামে একটি যুব সংগঠন তৈরী হয়েছিল। আজও কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে এই ছাত্র এবং যুবকরা বিভিন্ন কল্যানমূলক কাজ রূপায়নের ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামী প্রভানন্দ পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজীর পরামর্শ অনুযায়ী এই সংগঠনগুলির বুনিয়াদ রচনা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"। উপরোক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ঠাকুরের এই চিন্তা ধারাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনেকসময় এই দায়িত্ব নিতে গিয়ে অনেক সংগঠন ভুল – ভ্রান্তি করে থাকেন কিন্তু পরিষদ চেষ্টা করে ভুলগুলিকে  শুধরে দিয়ে কি করে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। লোকেশ্বরানন্দজীর মধ্যে একটি দিক যেটা প্রবলভাবে দেখা যেত "There is nothing negative, everything is positive".[১১] যেটা স্বামীজীর মধ্যেও দেখা যেত। বহু গ্রাম সংগঠনই প্রাথমিক থেকে আরম্ভ করে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে সার্বিক গ্রাম কল্যাণে নিজেদের নিযুক্ত করতে পেরেছে। এটা লোকশিক্ষা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং গনশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সবচেয়ে বড়ো অবদান। ১৯৬৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মেলা চলাকালীন

মহারাজ তৎকালীন ভারত সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী সুরেন্দ্র কুমার দে মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রদর্শনী এবং কৃষক সমাবেশে ভাষণ দেবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মেলায় কৃষি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, সেসব দেখে মন্ত্রী মহোদয় খুবই আনন্দিত ও আশ্চর্য হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে প্রথম বেসরকারীভাবে সরকারী কৃষি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হল। সে জন্য প্রশিক্ষণ ভবন, ছাত্রাবাস, কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়ে ট্রেনিং মেরামতি বিষয়ে প্রশিক্ষন কর্মসূচী সরকারী অর্থ সাহায্যে চালু করা সম্ভব হয়। এই প্রশিক্ষন কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে লোকশিক্ষা পরিষদের প্রশিক্ষণ বিভাগটি সংগঠিতভাবে গড়ে ওঠে।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ যখন নরেন্দ্রপুরে ছিলেন, তখন সুযোগ পেলেই তিনি লোকশিক্ষা পরিষদের গ্রামীন কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজেই যোগদান করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন। সেই সুবাদে তিনি বহু গ্রামে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে এবং গ্রামবাসীদের কল্যাণে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে 'ইউনিসেফ' – এর আর্থিক সহায়তায় শিক্ষার উপর জোর দিয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীকে পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে নিয়েছিল। এই সমস্ত কর্মসূচীগুলি ছাড়া পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সামাজিক বনসৃজন এবং ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষার ক্ষেত্রে পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ৭০ দশক থেকে পরিষদ অনুমোদিত গ্রামগুলিতে প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। কোথাও রাস্তার ধারে, কোথাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কোথাও বা সম্পূর্ন চাষের অনুপযুক্ত জমিতে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছে। রামবাগান বস্তিতে কাজের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা পরিষদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেকথা আগেই বলেছি। যেহেতু লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই

কর্মসূচীর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন, সেজন্য রামবাগানের মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা ছিল এবং প্রায় সমস্ত বস্তিবাসীর প্রত্যেকেকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। মহারাজ প্রায় বলতেন নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে কাজ এগোলে অর্থ কোনো না কোনোভাবে এসে যায়। রামবাগান গৃহনির্মাণ প্রকল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে ১৯ টি ব্লকে দুই কক্ষবিশিষ্ট ১৬ টি ফ্ল্যাট করে ৩৫০ টি পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটর আয়তনে ৩০০ বর্গফুট এবং প্রতিটি ফ্ল্যাটের নিজস্ব পায়খানা ও স্নানাগার রয়েছে। লোকশিক্ষা পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্যরকম – যাকে বলা হয় "convergence of service centering a poor family". প্রকৃতপক্ষে পরিবার নয়। শিশু থেকে শুরু করে পরিবার, পরিবার থেকে সমগ্রভাবে গ্রামীণ গোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট আর্থ সামাজিক স্তরে পৌঁছে দেওয়াই হল লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালিত কর্মসূচীর লক্ষ্য।[১২] স্বামী বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ যুব নেতৃত্বের বিকাশ সাধন এবং যুব সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের অভিনব উপায় সৃষ্টি করেছিলেন। সহস্র সহস্র যুবক যুবতী আজ স্বামী বিবেকানন্দের নামে উন্নয়নের এক সুসংহত আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। আর এই আন্দোলনের কেন্দ্রে আছে সেই ভাব যা মানুষের জন্য ও সেবার আদর্শে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহৎ প্রেরনায় উদ্দীপিত যুব সমাজ গ্রামের মানুষের সহযোগীতায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁর লোকশিক্ষা পরিষদের মধ্য দিয়ে শতসহস্র ছাত্র ও অনুরাগীদের মধ্যে এই উদ্দীপনা ও ভাবের সঞ্চারণ ঘটিয়েছিলেন।

# তথ্যসূত্রঃ-


১। উৎস *Reunion 1999,*(পত্রিকা), নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১১-১৪

২। *শ্রদ্ধা,* (পত্রিকা), নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৮ ডিসেম্বর, ২০০৮

৩। আরুনি চক্রবর্তী, ভাস্বর ঘোষ ও ভাস্বর দাসগুপ্ত, *নরেন্দ্রপুরঃ একটি ইস্কুলের বৃত্তান্ত,* সাউথ সুপ্রয়াস,কলকাতা, ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৪২-৪৬

৪। তদেব, পৃ. ৪৯

৫। ডঃ বৈদ্যনাথ বসু, *মহাজীবনের সান্নিধ্যে (দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতা, ১৫ ই জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৬২-১৬৪

৬। তদেব, পৃ. ১৬৬-১৭০

৭। Narendrapur Ramakrishna Mission Ashrama Praktani, *A tribute to Swami Lokeswarananda Centenary Volume,* Kolkata Sishu Sahitya Samsad Private Ltd., 19th April, Kolkata,2009, pp. 301-303

৮। Swami Asaktnanada, *Ramkrishna Mission Blind Boy's Academy,Narendrapur, Blind Boy's Academy: Golden jubilee Souvenir,*

Ramkrishna Mission Ashrama Narendrapur, Kolkata,18th January 2007, pp. 8-14

৯। *সমাজ শিক্ষা,* (পত্রিকা), লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, ১৯৭৬-৭৭, পৃ. ১৯৫-২০১

১০। ধীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ, *মহারাজঃ একটি ছাত্রঃ গ্রাম কল্যান,* বর্নালী প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৫-৪৮

১১। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, *স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (শতবর্ষের আলোকে),* শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, নানৃতম প্রকাশনী,কলকাতা, ১ মার্চ ২০০৯, পৃ. ৩৮৬-৩৯৮

১২। *উৎস পত্রিকা,* নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিন ২৪ পরগনা

# তৃতীয় অধ্যায়

# স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা

## ৩.১ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর চিন্তাধারাঃ

'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার' এর অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন একজন অন্যতম চিন্তাবিদ। তিনি যে সমস্ত বিষয়ে চিন্তাধারা করেছেন তার মধ্যে তাঁর ধর্ম চিন্তা বিশেষভাবে উল্লেখয্যেগ্য।

স্বামী লোকেশ্বরনন্দজীর ধর্ম চিন্তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে অবস্থান করে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রামকৃষ্ণের যে সমন্বয়বাদী ধর্ম চিন্তা সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে বিষদে আলোচনা করেছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মানব সভ্যতার একটা যুগ সন্ধিক্ষনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। যে সময়ে ধর্মান্ধবাদীদের বাড়াবাড়িকে কেন্দ্র করে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে লড়াই শুরু হয়েছিল সেই লড়াইতে বিজ্ঞান ও জড়বাদকে ভিত্তি করে প্রমান হয়েছিল যে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির পেছনে কোনো শ্রষ্টা নেই বা ঈশ্বর নেই অথাৎ পৃথিবী প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর নেই মানে ধর্ম নেই, ধর্ম প্রচার, ধর্ম গ্রন্থ, ধর্মীয় বানী সবই মিথ্যা। এর পাশাপাশি চলতে লাগিল ধর্ম সম্বন্ধে নানা রকম আজগুবি আলোচনা।সর্বত্রই (ভারতে ও ভারতের বাইরেও) লোকেশ্বরানন্দজী দেখিয়েছেন, এই সংকটকালীন মুহূর্তেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ক্ষেত্র কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাব।

কলকাতার শিক্ষিত মহলে তখন ধর্ম নিয়ে তুমুল তর্ক সে সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষত মানুষ পাশ্চাত্য প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত। তাঁরা ঈশ্বর লাভের সনাতন পন্থা ত্যাগ করে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করে আনন্দ পেতেন। লোকেশ্বরানন্দজী বলেছেন যে শাস্ত্রগ্রন্থ তাদের কাছে মূল্যহীন পাশ্চাত্য পন্ডিতের উক্তি বরং তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। পাশ্চাত্যের সবকিছুই তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর কল্যানকর ও যুক্তিসম্মত।[১]

সেই সময় সমস্যা শুধু দাসত্ব মনোভাবকে নিয়ে নয়। সমস্যা ধর্ম কেন মানবো তা নিয়েও। অনেকের ঝোঁক খ্রীষ্ট্রধর্মের দিকে এক দল হিন্দু নেতা হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য নানা রকমের সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্ম নিয়ে তখন প্রচুর বাক্ বিতন্ডা কোন ধর্ম শ্রেষ্ট এই নিয়েই বাক্ বিতন্ডা। হয় ধর্ম আদৌ মানব না। মানলে আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ বলতেন এই রকম মনে করা ঠিক নয়। যে একমাত্র আমার ঘড়িই ঠিক আর সব ঘড়ি ভুল। এই সংকীর্নতাকে তিনি নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন যে এই সংকীর্নতা থেকেই যত সমস্যা।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী রামকৃষ্ণকে ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে একজন সমন্বয়বাদী সাধক হিসেবে বর্ননা করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রেও রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন সমন্বয়বাদী সাধক। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছিলেন তার সাধনার মধ্য দিয়ে। লোকেশ্বরানন্দজী দেখিয়েছেন যে রামকৃষ্ণ বলতেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, নির্গুন ও নিরাকার। অর্থাৎ তার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। যেমন রূপ নেই তেমন নামও নেই। ভক্ত তাকে যে রূপে দেখতে চায় সেই রূপেই তাঁকে দেখতে পায়। সব রূপই তার রূপ সব নামই তার নাম। তাঁকে কালী, দূর্গা, শিব, বিষ্ণু, ইত্যাদি নাম নিয়ে অভিহিত করা হয়। ধর্ম ভেদেও তাঁর নাম বদলায়। কিন্তু তিনি একই।[২]

রামকৃষ্ণ কালীর উপাসনা করতেন তিনি বলতেন তোমরা যাকে ঈশ্বর বল আমি তাঁকে বলি কালী। তিনি বলতেন সব ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক সব ধর্মই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। চাই শুধু আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা।

শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতেরা শাস্ত্র পড়ে ধর্ম সম্পর্কে জেনেছেন কিন্তু রামকৃষ্ণ উপলব্ধির দ্বারা জেনেছেন। রামকৃষ্ণ যতভাবে সাধনা করেছেন ততভাবে  আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি বলেছেন যে পৃথিবীতে যেসব সাধু সন্তরা এসেছেন তারা বিভিন্ন রকরের উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর পথ অসংখ্য বা 'যত মত তত পথ'। রামকৃষ্ণ ছোটো বড় ভালো মন্দ সব পথ দিয়েই ঈশ্বর লাভ করার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত  ঈশ্বর লাভ করেছেন।

রামকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাবহারি দিকটার উপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন ঈশ্বর নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করে যেভাবে হোক তাঁকে লাভ কর। তাঁর জন্য কাঁদো। তাঁকে দেখা দিতে বল। তাহলে তিনি দয়া করে তোমার মনে যত প্রশ্ন তার সমাধান করে দেবেন। তাঁকে নিয়ে বিচার করাটা ঠিক নয়, তাঁর কৃপা করা। তার কৃপায় তাকে লাভ করাটাই বড় কথা।[৩]

ধর্মকে রামকৃষ্ণ জগৎ বা জীবন থেকে আলাদা করে রাখেননি, জগতের সব ক্ষেত্রে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে থাকবে, তার ফলে জগতের চরিত্র বদলে যাবে সব কাজই হবে ধর্ম ঈশ্বরোপাসনা- এই চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। মানুষের মধ্যেই ভগবান এই বানী তিনি প্রচার করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো ধর্ম মত প্রচার করেননি। যা সব ধর্ম মতের সারকথা তাই প্রচার করেছেন। সেই সারকথা হল পরম সত্যকে জানা, যে সত্য নিত্য অবিনশ্বর,

অপরিবর্তনীয় তাকে জানা। এই পরম সত্যের অপর নাম হল ঈশ্বর। এই সত্যকে জানলে মানুষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যই যখন ঈশ্বর, তখন সত্যকে জানা মানে ঈশ্বরকে জানা, অর্থাৎ ঈশ্বর স্বরূপ হওয়া। নদী যেমন সমুদ্রে পড়লে সমুদ্রে পরিনত হয় মানুষও তেমনি ঈশ্বর লাভ করলে ঈশ্বরে পরিনত হয়।[৪]

## ৩.২ শ্রী শ্রী সারদা দেবী সম্পর্কে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর চিন্তাধারাঃ

শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে গেলে আরও যে দুজন ব্যক্তির কথা উঠে আসে তাদের মধ্যে একজন হলেন সারদা দেবী। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী সারদা মাকে আলাদা ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি সারদা মা ও শ্রীরাম কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণ একা আসেননি চিহ্নিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি নিজে যেমন অসাধারন এরাও তেমনই অসাধারন। সবাই এক ছাঁচে ঢালা। আপাত দৃষ্টিতে অনেক অমিল কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট এক। সবারই লক্ষ এক পথও এক।সবাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণকেই খুঁজছিলেন"। শেষে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের ফলে তাঁর সান্নিধ্যে সবাই এসে উপস্থিত হলেন সময়ের ব্যবধানে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন।

লোকেশ্বরানন্দজী দেখিয়েছেন যে সারদা দেবী একে বারে সংসারের কেন্দ্র স্থলে বিরাজ করতেন। তিনি নেপথ্যোই থাকতে বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মারা যাওয়ার পর তিনি না চাইলেও আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদী ভাবাদর্শ প্রচার ও তার সব সন্তানদের রক্ষা করার মূল কান্ডারিতে পরিনত হন।[৫]

সারদা দেবীর জীবন ছিল অত্যন্ত জটিল। নারীর জীবনের তিন কুলের যে অবদান সেটা তাঁকে মেটাতে হয়েছিলেন। প্রত্যেকেটা ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছিলেন। কিন্তু যেটা লক্ষনীয় তাহলো এই যে, পরম মাতৃস্নেহে সকলকে সিক্ত করলেও তাঁর ভেতর সর্বদাই এক অপার্থিব নীরবতা, অনাশক্তি বিরাজ করতো, যেটি হিন্দু মতে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর মানুষের লক্ষন। বিভিন্ন পরিস্থিতে ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরেও তিনি এখন শান্ত অবিচল থাকতেন যে দেখেন মনে হত ওসব তিনি মোটেও চিন্তিত নন। তাঁর সহনশীলতা, প্রজ্ঞা, সাহস এবং বারবার পরীক্ষিত হয়েছে এবং যেসব অগ্নি পরীক্ষা তিনি এত অনায়াসে উত্তীর্ন হয়েছেন যা সকলকেই বিস্মিত করেছেন।

তিনি মানবী হয়েও দেবী ছিলেন। তাঁর দেবীত্ব যা কিছু তিনি করতেন তাঁর মধ্য দিয়েই ফুটে বার হতো। এমনকী সাধারণ সাংসারিক কাজ কর্মের মধ্যদিয়েও আপাত দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন সাধাসিধে মহিলা কিন্তু চিন্তায় বাক্যে কর্মে তাঁর মন সর্বদাই ঈশ্বেরর সাথে যুক্ত থাকতো। সংসারে থেকেও কীভাবে সংসারী না হওয়া যায় তা তিনি জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন।

সারদা দেবীর মধ্যে যে সমস্ত গুনের বর্ননা লোকেশ্বরানন্দজী করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল সার্বজনীন মার্তৃত্ব। এপ্রসঙ্গে লোকেশ্বরানন্দজী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল রামকৃষ্ণ চাইতেন তাঁর ত্যাগী সন্তানেরা রাতের নিস্তব্ধতায় অনেকক্ষন ধ্যান যপ করবেন তার জন্য তাদের লঘু আহারের দরকার। তাই তিনি প্রত্যেকের জন্য রূটির সংখ্যা বেঁধে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন জানতে পারলেন যে সারদা দেবীর স্নেহের প্রাবল্যে সেই সংখ্যা অতিক্রম করে যাচ্ছে। দোলনের আধ্যাত্মিক জীবনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে সারদা দেবীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তিনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, “তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব”।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত বিভূতি সারদা দেবীর মধ্যে, কিন্তু মাতৃত্বের কোমলতায় আবৃত মাতৃমূর্তি অদৃশ্য হলেও মাতৃ স্নেহ অপ্রকাশিত নয়।[৬] নরেন, রাখাল, লাটু, প্রমুখ প্রত্যেক ত্যাগী সন্তান মাতৃস্নেহের অভিব্যাক্তি বিভিন্নভাবে আস্বাদ করেছেন। সারদা দেবীকে তারা তখন চিনতে পেরেছিলেন না পারেন নি তা জানি না কিন্তু তিনি যে অসাধারন তা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর অসাধারনত্ব শুধু তাঁর মাতৃত্বে নয় তাঁর চরিত্রেও। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত সেই চরিত্র। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয় সেই চরিত্র। রামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগ সম্রাট তিনি ছিলেন ত্যাগ সম্রাজ্ঞী।

একজন মা যেমন তার সন্তানদের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেন তেমনি সারদা দেবীও রামকৃষ্ণে অনুগামী পুত্রতুল্য শিষ্যদের নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকেন। যখন শ্রী রামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন তখন তাঁর অবর্তমানে সমস্ত শিষ্যদের একত্রিত করে একটি সঙ্গে বেঁধে রাখার জন্য তার চিন্তার অন্ত ছিল না। রামকৃষ্ণের পরলোক গমনের পর সারদা দেবী বিভিন্ন স্থান ভ্রমন করলেও তার ত্যাগী সন্তানদের থাকা, খাওয়া এই সমস্ত চিন্তা সর্বদা তাড়া করে বেড়াত।

সারদা দেবী লেখাপড়া তেমন জানতেন না। তিনি সংস্কৃতও জানতেন না। তাঁর শিক্ষা জীবন সীমাবদ্ধ ছিল প্রথমভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে। তাঁর পড়াশুনা কম থাকলেও তিনি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি খুব সহজেই প্রত্যেকের মনের সংশয় দূর করতেন পারতেন। কোনো ব্যক্তিকে দেখে তিনি তাঁর মনের অস্থির অবস্থার কথা অনুভব এবং তার সমাধান করতে পারতেন। তাঁর নিজস্ব ধারনার উপর ভিত্তি করে সারদা দেবী সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিতেন যেটা অন্যান্য পন্ডিতদেরও অতিক্রম করত।

রামকৃষ্ণের শিষ্যরা প্রত্যেকেই অবতার পুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকেই অসাধারন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রত্যেকেই তেজস্বী ও যুক্তিবাদী, স্বাধীন চেতা, আত্মনির্ভর, শাস্ত্রজ্ঞ এবং অনুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু সারদা দেবীর কাছে তাঁরা যেন প্রত্যেকেই শিশু। এর কারন ছিল পুরু পত্নির পাশাপাশি মাতৃত্বের দৃষ্টি।

শ্রী রামকৃষ্ণ ভবিষ্যতের যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন সেই সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সারদা দেবীই। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বা সরাসরি সঙ্ঘ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও পরক্ষভাবে তিনিই বা তার মত অনুসারেই সঙ্ঘ পরিচালিত হত। শ্রী রামকৃষ্ণ যে সমন্বয়বাদী আদর্শ ও বানী ছিল সেগুলিকে তিনিই বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে যে যে বাণী গুলি সাধারন মানুষকে যুক্তির পথ দেখাবে এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী করে তুলবে।[৭]

সারদা দেবী জানতেন তাঁর শিষ্যরাই ভবিষ্যত্যের লোক শিক্ষার গুরু। আর এই সমস্ত কিছুই সম্ভব সঙ্গ গঠনের মাধ্যমে তাই তিনি সঙ্গ গঠনের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন এবং নিজের ও ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন। সঙ্ঘের সন্নাসীদের মধ্যে যখন বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্র করে মত বিরোধ দেখা দিয়েছে তখন তিনি যেই যুক্তি পূর্ন মতামত প্রমান করেছেন সেটাই সবাই মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ সারদা মায়ের অনেক যোগ্যতা ছিল।

তিনি কেবল জননীর স্নেহ নিয়েছেন বলেই তিনি সঙ্ঘজননী নন। সঙ্ঘকে সুনির্দিষ্ট পথে তিনিই চালিত করেছিলেন। মা যেমন অবোধ শিশুদের হাত ধরে নিজের জীবন দেখিয়ে শিশুকে পথ চলা শেখায় তেমনি সারদা দেবীও দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিকূল অনুকুল সমস্ত রকম পরিবেশে কী করে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বর, নির্ভরতা, সত্যনিষ্ঠা,

নিঃস্পৃহতা আপামর জনসাধারনের প্রতি সন্তান বাৎসল্য দেখিয়ে গৃহী ভক্তকে গার্হস্থ জীবনের আদর্শ দেখিয়েছেন ত্যাগী ভক্তকে সন্ন্যাসের আদর্শ। সংঘের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস্যা তাই সংঘ জননী। সঙ্ঘ পরিবারের কেন্দ্রস্থলে ছিল তার অবস্থান।[৮]

## ৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর চিন্তাধারাঃ

শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর আদর্শ ধন্য উত্তরসূরী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর ছোটো বেলা থেকেই যে দুরন্তপনা, সাহস, ধৈর্য সেসব আমাদের জানা। তাঁর অন্তস্থিত শক্তির কথা সারদা দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই জানতেন এবং তারা এও বিশ্বাস করতেন যে তাদের অবর্তমানে রামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শকে তিনিই বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবেন। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের লোক গুরু হয়ে উঠবেন।

ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যেই তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ হয়। গুরুর দেখানো পথেই তিনি ঈশ্বর লাভ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যা বলতেন এবং যা করেছেন তার কেন্দ্র বিন্দু হলো মানুষ। মানুষকে নিয়েই তাঁর যত চিন্তা। মানুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন মানুষই একমাত্র ঈশ্বর, যে ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। বলতেন, 'মানুষ গড়াই আমার ব্রত'।[৯]

তিনি কোনো মানুষকে ঘৃনার চোখে দেখেননি। সকল মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বর উপলব্ধি করেছেন। তিনি সাধারন মানুষকে জীব জ্ঞানে শিব সেবার কথা বলতেন। তাই তিনি বলেছেন, "ছাড়ি কোথা হেথা সেতা খুঁজিছ ঈশ্বর  জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

মানুষই স্বামীজীর কাছে ভগবান। মানুষের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই ঈশ্বর বুদ্ধিতে মানুষের সেবাই তাঁর কাছে ধর্ম। জীব প্রেমই ঈশ্বর সেবা। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ মান। মন্দিরেও বিরাজ করছেন। কিন্তু মন্দিরে যে বিগ্রহ আছেন, তিনি 'অচল' তিনি নরেন-চরেন না, কথা বলেন না। কিন্তু আর্ত মানুষ কথা বলেন, দুঃখ জ্বালায়, তার দুঃখ দূর করে দিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মন্দিরের বিগ্রহ যেমন ঈশ্বর বিগ্রহ মানুষও তেমন ঈশ্বরের বিগ্রহ। পার্থক্য এই যে একজন অবাক আর একজন সবাক। লোকেশ্বরানন্দজী বলেছেন, স্বামীজী এই সবাক, সচল ঈশ্বর বিগ্রহের দুঃখ বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করতেন। তাঁর সবকিছু উদ্যম এই সচল বিগ্রহকে কেন্দ্র করে। এই বিগ্রহের দুঃখ দূর করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।[১০]

স্বামীজী ভারত প্রেমী ছিলেন কিন্তু তা এই জন্যে নয় যে ভারত তাঁর জন্মভূমি ছিল। ভারত তাঁর কাছে পুন্যভূমি, কারন ভারত ঋষির দেশ। সেই সব মানুষের দেশ যাঁরা সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতেন। স্বামীজি ভারতকেই সত্য বলে সম্বোধন করেছিলেন, বলেছিলেন, ভারতের মৃত্যু ঘটলে সত্যের মৃত্যু ঘটবে। ধর্ম লোপ পাবে। সমস্ত উচ্চ চিন্তা মুছে যাবে। শুধু ভারতের বেঁচে থাকা দরকার। এই বেঁচে থাকা শুধু তার নিজের জন্য নয় বেঁচে থাকা দরকার সমগ্র পৃথিবীর জন্য। কারন ভারত সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম গুরু।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে হিন্দু ধর্মকে তুলে ধরার জন্য সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি যেভাবে হিন্দু ধর্মকে তুলে ধরেন সেখান থেকে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা চোখে পড়ে। সেখানে তিনি বলেন, আমরা শুধু সকল ধর্মে সহ্য করি না। সকল ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে কিন্তু তারা সমুদ্রে এসে সব এক হয়ে যায়। তেমনি ভগবান আমাদের সকলের লক্ষ্য। আমাদের বিভিন্ন রুচি তাই আমরা সবাই

পৌঁছাব। লোকেশ্বরানন্দজী বলেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে মহৎ থেকে মহত্তর করতে চেয়েছিলেন। ক্ষমা, প্রেম, উদারতার পথে সে মহৎ হতে পারে অন্য পথে নয়। বলবান তার বল প্রয়োগ করুক গঠনের পথে কল্যানের পথে, পরার্থে শুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।

লোকেশ্বরানন্দের দৃষ্টিতে স্বামীজী ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সত্যকে কোনো ধর্মের সম্পদ বলে মনে করতেন না।সব ধর্মের মধ্যেই সত্য রয়েছে। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা,ক্ষমা, উদারতা সব ধর্মেই এই গুন গুলির মহিমা প্রচার করেন। সত্যই ধর্ম সত্যই ঈশ্বর। স্বামীজী বলতেন সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।[১১]

স্বামীজী কিন্তু কোনো ধর্মকে ছোটো করে হিন্দু ধর্মকে বড়ো করে দেখেননি বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেননি। বরং তিনি খ্রীষ্টের বানীর যেসব মহৎ দিক সেগুলি আরও উজ্জ্বল করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজীর বক্তব্য খ্রীষ্টান ধর্ম আরো ভালো খ্রিষ্টান হোক, হিন্দু আরও ভালো হিন্দু হোক, মুসলমান আরও ভালো মুসলমান হোক, এই ধর্ম আদর্শই তিনি শিকাগো ধর্ম মহা সভাতে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এইরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পাশ্চাত্য জগৎ পরিচিত দিল না। স্বামীজির এই আহ্বানের ফলে খ্রীষ্টান ধর্মের আস্তে আস্তে সংকীর্নতা গুলি শিথিল হতে লাগল। স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর পরস্পরকে জানুক অন্ততঃ জানার পর যদি পাশ্চাত্য প্রাচ্য থেকে কিছু নেয় বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য থেকে কিছু নেয় তাহলে উভয়েরই মঙ্গল। স্বামীজি চেয়েছিলেন প্রাচ্য বিশেষত ভারত পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিখুক। তেমনই পাশ্চাত্য প্রাচ্য থেকে তথা ভারত থেকে ধর্ম শিখুক।

ভারত বলতে স্বামীজী হিন্দু ভারতকেই বুঝতেন না। সমগ্র ভারতকে বুঝতেন। তিনি ইসলামের গুনগ্রাহী ছিলেন ও ইসলামের অবদানের কথাও অনেক বলেছেন। তেমনই যীশুর ও খ্রিষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক কথা বলছেন। যখন যে বিষয়ে তিনি কথা বলতেন তখন মনে হত তিনি ঐ বিষয়েরই অনুরাগী তাঁর মুখে বুদ্ধের কথা শুনে অনেকে তাঁকে বৌদ্ধ মনে করতেন।

স্বামীজী সারা বিশ্ব ব্যাপী কোনো বিশেষ ধর্ম মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। দেবতা এবং মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তে যে দেবত্ব সেটা কীভাবে মানুষকে শেখানো যায় মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো। মানুষের মধ্যে সুপ্ত দেবত্ব বর্তমান। জীবনের উদ্দেশ্যে, সেই সুপ্ত দেবত্বকে জাগ্রত করা মানুষ অমৃতের সন্তান, সে পাপী নয়। মানুষ ভুল করে নিতে পারে। যে আজ পাপী, কাল সে পুন্যাত্মা, মানুষই নিজের ভাগ্য বিধাতা। সে ইচ্ছা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। এই ছিল স্বামীজীর ধর্ম চিন্তা।[১২]

## তথ্যসূত্রঃ-


**১। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *বাস্তব জীবনে আধ্যাত্মিকতা,* উদ্বোধক কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩২-৩৪**

**২। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *বিশ্ববরেন্য শ্রীরামকৃষ্ণ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা. ১৬-৩০**

৩। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *রামকৃষ্ণ পরমহংস,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ৪১-৫০

৪। স্বামী অক্ষরানন্দ, *উদ্দীপন,* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা, ৭৯-৮২

৫। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২৮৬-২৯০

৬। Sri C. J. Stocks & Sri Ujjal Bose, *Falguni*, Ramkrishna Misson Vidyalaya, Narendrapur, 1967-1968, page. 38-43

৭। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *বাস্তব জীবনে আধ্যাত্মিকতা,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৮-৪৩

৮। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪০৯-৪২৩

৯। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *বাস্তব জীবনে আধ্যাত্মিকতা,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৮-৪৩

১০। স্বামী অক্ষরানন্দ, *উদ্দীপন,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৫-১৯০

১১। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *যুব-নায়ক বিবেকানন্দ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা. ৪৭-৫৭

১২। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ৭১-৮২

# চতুর্থ অধ্যায়
# লোকস্মৃতিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

ঐতিহাসিকের মহাফেজখানা সাধারণভাবে যে সব উপাদান-উপকরণ দিয়ে তৈরী হয়, সে সব ছড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় 'মেমরি' অর্থাৎ স্মৃতি, স্মৃতিজিনিসটি একটা জটিল সংঘটনা পরিভাষায় বললে 'কমপ্লেক্স ফেনোমেনন', সাধারণভাবে আমরা যা যা মনে করতে পারি, নিছক সেগুলোই কিন্তু স্মৃতি নয়। কিংবা যে সব নথিপত্রের সাহায্যে আমরা অতীতের একটা আদল গড়ে তুলতে পারি, স্মৃতিকে স্রেফ তার মধ্যেও বেঁধে ফেলা যাবে না, ধরা যাক এমন কিছু যা আমরা সব সময় সচেতন ভাবে ঠিক মনে করতে পারব বলে ভাবিওনি। অথচ সত্যিই একদিন কোনও একটা অনুসঙ্গে তা মনে পড়ে গেল। সে সবও স্মৃতির মধ্যেই পড়ে। ঠিক এখান থেকেই একটা প্রশ্ন ওঠে আসে মানুষ কী মনে করতে চায়, কথাটা তা নিয়ে নয়। কথাটা এই যে, মানুষ কী মনে করতে চায় না, এ এমন এক বিস্মৃতি যা আমাদের জীবনের নানা আঘাত, নানা তিক্ততার মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। সুতরাং ঐতিহাসিকরা যেটুকু উদ্ধার করতে পারেন স্মৃতি জিনিসটা তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, আর যে সন্ধানী-ইতিহাসবিদ অতীতের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বলেন, 'সবটা বলো' অতীতের আদ্যোপান্ত যিনি খুঁড়ে দেখতে চান। তাঁর দিকেও একটা নৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় স্মৃতি। যে সাক্ষাৎকার গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেগুলির সাথে জড়িয়ে আছে'সেন্টিমেন্টালিটি' ও 'নস্টালজিয়া' আর তাকে তুলে আনাই হল মূল অভিপ্রায়।

এখানে এই স্মৃতিগুলির একটা বিশেষ দিক খেয়াল করা দরকার। সেটা হল 'ট্রমা'র অনুভূতি এবং 'অতীত' এর সঙ্গে সেই অনুভবের একটা  বিরোধমূলকসম্পর্ক, যে কোনো ইতিহাসের আখ্যান যে নীতি মেনে লেখা হয়, তার ঠিক উল্টো দিকে আছে এই স্মৃতি। আবার একই সঙ্গে, স্মৃতিটা যদি;ট্রমা'র হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ঘটনা, অর্থাৎ যা কিনা 'ট্রমা'রকারণ, তার কথা মানতেই হবে তাকে সংশ্লিষ্ট অতীতের প্রেক্ষাপক্ষে পেশ করতে হবে। ফলে 'ট্রমা'র শিকার যিনি তাঁর বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা পাবে। এ ক্ষেত্রে বিবরণ যিনি দিচ্ছেন এবং যিনি পড়ছেন উভয়েই সেই একই অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র থাকতে পারে। তবু এই বিবরণ কখনোই অতীতের 'হিস্টরিসিস্ট' ভাষ্য হবে না, কারন সেই ভাষণ কোনও অপ্রত্যশিত উপাদানকেজিইয়ে রাখতে চায় না বরং যা কিছু অপ্রত্যাশিত,সেসবের ব্যখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে এইভাবে 'ট্রমা' ঘটনা থেকে যে শক, যে মানসিক আঘাতটা তৈরী হয়, তাকে প্রশমিত করতে চায়। ইতিহাসের আখ্যান ('হিস্টরিক্যাল ন্যারেটিভ') কী করে গড়ে ওঠে? ইতিহাসের আখ্যান বলতে, এমন একটা বিবরণ যা কিনা ধাপে ধাপে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি পর্যন্ত পৌঁছায়, কীভাবে ঘটল তা ব্যখ্যা করে, জানায় যখন সত্যিই ঘটনাটা পর্যন্ত পৌঁছায়, কীভাবে ঘটল তা ব্যাখা করে,  জানায় যখন সত্যিই ঘটনাটা ঘটেছিল, তখন কেন ঘটেছিল। ঘটনাটার ব্যাখ্যা থাকা দরকার। যা কিছু ব্যাখ্যা করা কঠিন, যেমন দুর্ঘটনা, সমপাত, কিম্বা 'কনফারেন্স' সে সব ইতিহাসের প্রান্তিকে ঠাঁই পায় সে সব জিনিস সংশ্লিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে খুব জরুরি হলেও তাদের প্রভাব কখনই ঐতিহাসিকের যা অভীষ্ট, সেই কার্যকারণ সম্পর্ককে ছাপিয়ে উঠতে পারে না।

নীচে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া হলঃ-

## প্রশান্ত কুমার গিরিঃ

প্রশান্তকুমার গিরির বর্তমান বয়স ৭০ বছরের কাছাকাছি। ওনার সাথে পরিচয়  আগে থেকেই ছিল। তবে আলোচনায় বসা হয় ২২ শে অক্টোবর ২০১৮।

প্রশান্ত কুমার গিরি অনেক কম বয়স থেকেই মহারাজের সাথেবিভিন্ন কাজে যুক্ত। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং (নরেন্দ্রপুরেরই) বাসিন্দা। তিনি প্রায় নরেন্দ্রপুরের প্রতিষ্ঠা থেকেই অর্থাৎ নরেন্দ্রপুরের ভিত্তিস্থাপন থেকেই নরেন্দ্রপুরকে দেখে আসছেন। লোকেশ্বরানন্দজীকে তিনি যখন প্রথম দেখেন তখন বেশ কিছুটা অবাক হয়েছিলেন যেরকম লম্বা, দিব্যকান্তি মূর্তি, টিকালো নাক – যা তিনি এর আগে কোনো মহারাজকে দেখেননি। লোকেশ্বরানন্দজী যে জাতি, ধর্মের বিভেদ মানতেন না, তা নয় কিন্তু তিনি এসবের উর্দ্ধে ছিলেন। নিচু বর্ণের ছেলে সে ঠাকুরঘরে ঢুকতে পারবে না – একথা তিনি একবারও বলেনি নি। হিন্দু মুসলিম, ক্রিশ্চান, হিন্দু দলিত এরা সবাই ঠাকুরের কাজ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গেই যদি লিঙ্গ বিভেদের ব্যাপারে আসা যায় তাহলে লোকেশ্বরানন্দজী কিন্তু কামিনীকাঞ্চনের ব্যাপারে খুব সতর্ক করেছেন, এপ্রসঙ্গে তিনি স্বামিজীর প্রসঙ্গে তুলে এনে বলেন স্বামীজী বিদেশে যাচ্ছেন সেখানে তাঁর অনেক মহিলা শিষ্যা ও হয়েছে এবং একই সাথে গাড়ী করে যাচ্ছেন- আসছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক মহারাজ মহিলাদের  সাথে একটি গাড়ীতে গেলেও লোকেশ্বরানন্দজী কিন্তু এক গাড়ীতে যাননি বরং মহিলাদের জন্য অন্য গাড়ীর ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু তিনি কর্মজগতে পুরুষদের থেকে মহিলেদের কখনোও পিছিয়ে রাখেননি। ১৯৫৬ সালে নরেন্দ্রপুর অঞ্চলের লোকজনরা শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু কিছু লোকের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পদ থাকলেও তাদের বাড়ী ঘর ছিল খুব সাধারণ ধরনের। এই নরেন্দ্রপুরের চারপাশে বিভিন্ন

অনেক ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু সেগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিন্তু নরেন্দ্রপুরেরপ্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমস্ত ধরনের লোক কিন্তু মহারাজের কাছে আসত। বিশেষ করে মহারাজের মৃত্যুর পর মুসলিমরা যেভাবে ভিড় করে মহারাজকে দিকে দেখতে এসেছিল তা ইতিহাসের পাতায় এক অনন্য নজির রাখার মতো। এই ভালোবাসা কীসের জন্য ? প্রশান্ত কুমার গিরি এপ্রসঙ্গে দুটি গল্প বললেন – আশ্রমের বাগান থেকে কাঁঠাল চুরি করে পালানোর সময় চোর ধরা পড়েছে। মহারাজের কাছে নিয়ে গেলে, মানুষটি শাস্তি হিসেবে পেল চুরি করা কাঁঠাল, কিছু নগদ টাকা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। কারন সে অভাবে পড়ে ঐ কাজ করেছে। এবং আরেকবার একটি ছেলে পরীক্ষায় খারাপ ফল করেছে। তিনি তাকে বললেন – কিছু ভেবো না, পরিশ্রম করো; দেখবে পরীক্ষায় কত ভাল করবে। তিনি সবসময় স্পষ্ট কথা, সত্যি কথা বলার জন্য বলতেন, মাথা উঁচু করে হাঁটবে। তিনি বলতেন দরিদ্র হতে পারি, দারিদ্র কিন্তু কোনো অপরাধ নয়,এছাড়াও তিনি আত্মমর্যাদার কথা বলতেন। মহারাজের মনের জোর ছিল প্রচন্ড। তিনি স্কুলবাড়ীর মধ্য দিয়ে কলেজের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে শুরু করেন এবং পরে তা সাফল্য অর্জন করে। রাজনীতি বাহিরে থাকলেও নরেন্দ্রপুর মিশনে নেই বললেই চলে কিন্তু ১৯৭০এর দশকে জুন মাসে বামপন্থীদের প্রেরণায় বন্ধ্ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, পার্টির অনেক লোকজনই মহারাজের খুব স্নেহধন্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ নিজেই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। আরেকটি বিশেষ যে দিকটা আমি জেনেছি,লোকেশ্বরানন্দজীর সময়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকেই অনেক ছাত্র আসত নরেন্দ্রপুর পড়াশোনা করতে প্রশান্ত স্যারের কথায় প্রায় ৬০% বাংলাদেশের ছেলে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। তার মানে এই নয় যে নরেন্দ্রপুরের সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল। শুধুমাত্র এই সমস্ত দুঃস্থ শিশুদের বাঁচানোর জন্য এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য লোকেশ্বরানন্দজী তাঁদের এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এবার একটু বলে নিই লোকেশ্বরানন্দজীর ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে। প্রশান্ত কুমার গিরি বলছেন লোকেশ্বরানন্দজী নিয়মিত ঘড়ি ধরে জপ ধ্যান না করলেও সময় নিয়ে ধ্যান করতেন। তিনি ধর্মীয় জীবনের নিয়মাবলী পালন করলেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবহেলা করতেন না। অর্থাৎ কর্মকে তিনি পূজা হিসেবেই নিতেন। মহারাজজী নিজেই একবার প্রশান্ত কুমার গিরিকে বলেছেন, ঠাকুরকে বলবে। ঠাকুর আমায় দেখো, আমার মঙ্গল করো। এটা ওটা চাইতে নেই, কারণ তুমি তো জাননা কোনটা পেলে তোমার প্রকৃত মঙ্গল হবে। ঠাকুরকে সব ছেড়ে দাও, তিনিই ঠিক করে দেবেন।

মহারাজের আরেকটি যে গুণ ছিল তা হল পশু-পাখীর প্রতি ভালোবাসা। প্রশান্ত কুমার গিরি আরেকটি গল্প বলেছেন যে, মহারাজ যে ঘরে বসতেন রোজসকালে বাহিরে থেকে শালিক পাখি জানালা থেকে উড়ে এসে মহারাজের হাত থেকে খাবার খেত, মহারাজের শরীর যাবার পর থেকে তাঁর  এক কর্মচারী খাবার দেওয়া সত্ত্বেও পাখীগুলো আর আসে না। প্রকৃতির কি পরিহাস![১]

## হরপ্রসাদ সমাদ্দারঃ

হরপ্রসাদ সমাদ্দারের সাথে বিষয় নিয়ে আলোচনার বসি ৫ ই নভেম্ভবর ২০১৮,তাঁর বাড়ীতে।

হরপ্রসাদ সমাদ্দারের বর্তমান বয়স ৭০ বৎসর। বর্তমানে তিনি রাজপুর কালীতলার কাছাকাছি বসবাস করেন, তিনি নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ১৯৫৮ সালে ছাত্র হিসেবে এসেছিলেন এবং লোকেশ্বরানন্দজীকে

প্রথম দেখেন। তাঁর চোখে লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ ছিলেন মানবিক, সহানুভূতিশীল, দূরদৃষ্টিবান, একজন বীর সন্ন্যাসী। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কিন্তু তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে শিক্ষার উন্নতি, সমাজের কল্যাণ এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি। লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ধর্মকে ধারন করেছিলেন, তাঁর ধর্মের অন্যতম একটি বাণী ছিল "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"। অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ। এটাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য এবং এর পাশাপাশি ছিল চরিত্রগঠন।

মহারাজ সবসময় বলতেন " তুমি একজন ভালো মানুষ হও, তাহলে তুমি সমাজের একটি সম্পদ হয়ে উঠবে এবং ভালো মানুষ হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।" হরপ্রসাদ সমাদ্দার স্বাধীনতার আগের দেশটাও দেখেছেন আবার স্বাধীনতা পরের দেশটিও দেখেছেন তাঁর মতে, মানুষের মনে নতুন কিছু করার একটা উদ্বেগ লেগেই ছিল এবং তাঁর মতে,নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সরকারের কাছে থেকে সে এত সাহায্য পেয়েছ এটাও হয়তো অন্যতম একটা কারণ। রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিভঙ্গিই হলো মানবকল্যাণে কাজ করা, এই মানবকল্যাণ করার জন্য শিক্ষা খুবই জরুরী। শিক্ষারমাধ্যমে অন্ধকার দূর করা যায়, আর এই অন্ধকার দূর না হলে মানুষ কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। তাঁর মতে, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে লোকেশ্বরানন্দজীর মতো সম্মান আর কোনো মহারাজই পাননি। লোকেশ্বরানন্দজীর যে রকম ব্যক্তিত্ব ছিল তাতে তাঁর প্রেসিডেন্ট হবার কথা কিন্তু বেলুড় মঠ তাকে প্রেসিডেন্টও করেননি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যও করেননি কিন্তু মহারাজ এসব নিয়ে কিছু মনে করতেন না কারণ তিনি সমাজ থেকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছিলেন তা তাঁর কাছে অনেক। পরবর্তীকালে তিনি স্বামীজীর দেখানো পথকেই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। মহারাজ কিন্তু কখনো কাউকে ছোটো করে দেখতেন না। এরই ফলস্বরূপ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সমাজে সে তিন ধরনের সেবা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান দিতে পারছে না ফলে ব্রাহ্মসমাজ,প্রার্থনা সমাজ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে টিকে থাকতে

পারেনি। মহারাজের কাছে কাজের কোন ভাগ ছিল না। বেলুড় মঠ থেকে যে কাজই তাঁর কাছে আসত, মহারাজ সেই কাজই একজন সন্ন্যাসী হিসাবে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতেন। সারদা মঠ ও মিশনের প্রতি বেলুড় মঠের একটু সমস্যা থাকলেও লোকেশ্বরানন্দজীর কিন্তু কোনো সমস্যাছিল না। তাঁর মতে, লোকেশ্বরানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন বর্তমানেও পুরোনো সেই আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছে কিন্তু সেই ধরনের যুগের মহারাজ আর দেখা যায় না, সুতরাং আদর্শকে ধরে রাখবে কী করেই এটাই তার কাছে বড়ো প্রশ্ন। তাঁর মতে পুরো ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধন অনেকটা আলগা হয়ে গেছে। তাঁর মতে, প্রয়োজনের স্বার্থে নরেন্দ্রপুরকে সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় ঠিকই কিন্তু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন কোনো রাজনীতিতে যুক্ত থাকে না সেই লোকেশ্বরানন্দজীর সময়কাল থেকেই। বাংলাদেশের সাথে সরাসরিভাবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন যুক্ত না থাকলেও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ছিল ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের রক্ষাকর্তা এবং এই মিশন থেকে ঢাকার অনেক সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি সাহায্য পেয়ে থাকে।[২]

## মহম্মদ কুব্বত বাগানীঃ

মহম্মদ কুব্বত বাগানী-র সাথে মহারাজকে নিয়ে আমার প্রথমকথা হয় ১৪ ই নভেম্বর ২০১৮, তাঁর বর্তমান বয়স অনূর্ধ ৮০।

তিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা, তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে স্বচক্ষে দেখেছেন। আগে ফাঁকা মাঠ ছিল মহারাজরা আসত এবং সিনেমা দেখাত তাঁর মধ্যে কুবের মহারাজ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রপুরে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে করতে মহারাজের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়। মহারাজকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল খুব ভালো মানুষ, কথাবার্তা ভালো, লোককে ভালোবাসেন। তাঁর মতে, সমাজের জন্য কিছু

করলেও মনে হয় কিছু করেননি তাঁর কারন এখানকার মুসলিম ছেলেদের কাজ দেবার কথা ছিল কিন্তু হয়নি,পরে যদিও কিছু লোকজন কাজ পেয়েছিল। শিক্ষার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন মহারাজরা শুধুমাত্র বড়লোকদের ছেলেদেরই ভর্তি নিতেন যদি বিপদে কোনো সুবিধা পাওয়া যায়। লোকেশ্বরানন্দজী নরেন্দ্রপুরে আসার পর থেকে শুধুমাত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশনকে নিয়েই ভেবেছেন বাহিরের মানুষজনদের কথা খুব একটা বেশী ভাবেননি কিন্তু লোকেশ্বরানন্দজী সকল মানুষকে একসাথে মিলেমিশে থাকতে বলতেন। মহারাজ গরীবদেরকে অনেক দানও করতেন, মহারাজের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত ধর্মই ধর্মের মূল বিষয় অর্থাৎ ধর্ম এক ও অভিন্ন। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক পরিবর্তনও হয়েছে সেটাশিক্ষার ক্ষেত্রেও এবং পরিবেশগত দিক থেকেও লোকেশ্বরানন্দজী কখনো কাউকে খারাপ মনোভাব নিয়ে ছোটো চোখে দেখতেন না। তাঁর মতে, লোকেশ্বরানন্দজী কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন সন্ন্যাসী হওয়ার থেকে কেরিয়ার কেন্দ্রিক জীবনযাপনের জন্য বেশী জোর দিতেন। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ তে কোন বিভেদ করেননি কিন্তু নরেন্দ্রপুর যে পুরুষকেন্দ্রিক এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন নরেন্দ্রপুরে মহিলা প্রভাব যে পড়েনি তা বলা একেবারেই ভুল তবে লোকেশ্বরানন্দজী এসব থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকে তা নরেন্দ্রপুর মিশন ধরতে দেয় না তা এই বাসিন্দার কথায় খুবই স্পষ্ট। তবে নির্দিষ্টভাবে কোনো দলীয় স্বার্থে থাকে না। লোকেশ্বরানন্দজী নাকি মুসলিম রাজ্য থেকে বেশী টাকা পেয়েছিলেন নরেন্দ্রপুরকে গড়ার পিছনে। যদিও অসৎ কাজ তিনি কিছু করেননি। লোকেশ্বরানন্দজী ও বিষ্ণু মহারাজ প্রথম আমেরিকা যাবার সুযোগ পান। তবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রধানত শিক্ষার জন্যই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু নরেন্দ্রপুর প্রতিষ্ঠালগ্নে নরেন্দ্রপুরের মানুষজন শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পায়নি। নরেন্দ্রপুরের এই জমি পুরোপুরি মুসলিমদের, অনেক ঝামেলা, মামলা-মোকদ্দমা করে

মিশন তা অধিকার করে, তাঁর মতে, কানাই মহারাজ ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ, সবাই তো তার সমান নয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠা হয়ে যে বড়ো সুবিধা হয়েছে তা হল এখানে বড়ো ধরণের কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় না। আমরা দেখি নরেন্দ্রপুরে অনেক ওপার বাংলার ছেলে পড়াশোনাকরে এবং অফিসে অনেক ওপার বাংলার লোকজন কাজকর্ম করে। এমনকি বাংলাদেশেও রামকৃষ্ণ মিশন আছে ঠিকই কিন্তু জানতে হবে বাংলাদেশের সাথে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন লোকেশ্বরানন্দজীর সময়কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে যুক্ত নেই।[৩]

## শরদ কুমার মিরানীঃ

শরদ কুমার মিরানীর সাথেআলোচনায় বসি ২২ শে নভেম্বর ২০১৮ সালেনরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের একটি ঘরে।

বর্তমানে স্যারের বয়স ৭০ বছর। অর্থাৎ তিনি ছোটোবেলা থেকেই লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে দেখেছেন। কিন্তু পরে যা জেনেছি তাতে দেখেছেন বলাটা ভুল, মানুষই হয়েছেন মহারাজের কাছে। ১৯৫৯ সালে মহারাজের সাথেতাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। মহারাজকে দেখে তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছিল খুব আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, স্মিতভাষী। স্বাধীনতার পর পরই আমরা মহারাজকে পাই নরেন্দ্রপুরে, সেক্ষেত্রে শরদ কুমার মিরানী বলছেন প্রধানত মহারাজ ছিলেন এক দক্ষ শিক্ষাবিদ। সাধারণ মানুষের শিক্ষার উন্নতির জন্য খুব ভাবতেন তাঁরই ফলস্বরূপ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা নরেন্দ্রপুরকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল তখন লোকেশ্বরানন্দজী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মহারাজ প্রধানত শিক্ষার সংস্কারের দিকেই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতে বিশ্বাস করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে তিনি মনে প্রাণে

বিশ্বাস করতেন এবং স্বামিজীর অনুপ্রেরণা নিয়ে চলতেন। লোকেশ্বরানন্দজী চাইতেন ছাত্ররা সন্ন্যাসী হোক বা নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলুক তারা যেন সমাজকে দেখে। মহারাজ যেটা বিশেষভাবে বলতেন তা হল "মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কখনো কার্পন্য কোরো না।

উদার মনে, মনপ্রাণ খুলে ছাত্রদের বিদ্যাদান করো"। শিক্ষার সাথে যেহেতু মঠ বা মিশন ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে তাই এটি শিক্ষার সাথে পরিপূরক। মহারাজের ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। মহারাজ খেলাধূলা খুব পছন্দ করতেন। খুব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সময় দিতেন মাঠে। কোনো ছাত্র ক্যাচ মিস করলে তাকে পরেরটা পারার জন্য উৎসাহ দিতেন। তাঁর অভিধানে নেগেটিভ কিছু ছিল না, সবই পজিটিভ। আরেকদিক থেকেও তিনি যেভাবে গরীব দুঃখীদের দান করতেন, সেদিকথেকে তাঁকে সমাজ সংস্কারকও বলা যেতে পারে, তিনি সমাজের নীচু তলার ছেলেদেরও শিক্ষার উন্নতির জন্য নরেন্দ্রপুর মিশনে এনে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি সমাজের সাথে শিক্ষা সংস্কারের একটা মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তিনিই নরেন্দ্রপুরে অন্ধদের উন্নতির জন্য এবং শিক্ষার জন্যব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, এই সংস্কারের মধ্যে কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা থাকবে না। গোটা দেশে সামাজিক মতপরিবর্তনের সাথে সাথে রামকৃষ্ণ মিশন এর ও আদর্শগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে এটা মানতেই হবে। ধর্মীয় উগ্রতাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ যেভাবে শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করছে এর থেকে উদ্ধারের জন্য লোকেশ্বরানন্দজী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সমাজে খুবই প্রয়োজন। বর্তমান সমাজে স্বামীজীকে বা স্বামীজীর অনেক বাণীকে অনেক রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু স্বামীজী কোনদিনই রাজনীতি চাননি বরং খেলাধূলা, শরীরচর্চার উপর জোর দিয়েছেন। শরদ কুমার মিরানীর মতে, সমাজের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে সরকারের সাথে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের একটা সম্পর্ক তো রাখতেই হয়, তাবলে এই নয় যে কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জড়িয়ে গেল, তাঁর মতে, স্বাধীন দেশে সরকারী

সাহায্য ছাড়া কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠান চলা খুব কঠিন। কারণ সাধারণ মানুষের সঠিক উন্নতি এবং শিক্ষার খরচ চালানো খুব কঠিন যার নমুনা বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুলগুলিতে দেখা যায়। রামকৃষ্ণ মিশন কোনো দলীয় স্বার্থ মেনে চলে না সে বামপান্থীই হোক আর দক্ষিনপন্থী হোক। বরং তারা তাদের স্বার্থে রামকৃষ্ণ মিশনকে কাজে লাগিয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশন তাদের কোনো ধারা অবলম্বন করেনি[৪]।

## সত্যাত্মনন্দজী মহারাজঃ

মহারাজের সাথে ৩০ শে নভেম্বর ২০১৮ সালে প্রথম আলোচনায় বসি মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠে মহারাজের অফিস ঘরে।

বর্তমানে মহারাজের বয়স ৭০ বছর। তিনিও লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে নিজে চোখে দেখেছেন এবং বেশ কিছু বছর একসাথে নরেন্দ্রপুরে কাটিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে সত্যাত্মনন্দজী মহারাজ প্রথম নরেন্দ্রপুরে আসেন এবং তখন থেকেই লোকেশ্বরানন্দজীর সাথে তাঁর পরিচয়। মহারাজ নরেন্দ্রপুরে ২০১১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। লোকেশ্বরানন্দজীকে দেখে তাঁর প্রথম মনে হয়েছিল বিশাল এক ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, খুব উদার এক Dynamicচরিত্রের মানুষ, সবাইকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ শিক্ষাসংস্কারের মধ্যে দিয়ে সমাজসংস্কার করেছিলেন। শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে বলতে নিয়ে তিনি বললেন অভিভাবক, শিক্ষক তাঁরা সবাই চায় তাদের ছেলেপুলে, ছাত্র সবাই ভালো হোক, বড়ো হোক কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা যেটা আশ্রমের মধ্যে চলে অর্থাৎ আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বাহিরের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেকাংশেই আলাদা। তাঁর মতে লোকেশ্বরানন্দজীর চিন্তাভাবনার প্রকাশ সমাজে বেশী পরিলক্ষিত বা প্রভাবিত হয়নি তাঁর সঙ্গে যারা মিশেছিল তাদের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। লোকেশ্বরানন্দজী বলতেন কোনও ছাত্র সন্ন্যাসী হোক বা

চাকুরিজীবীই হোক সে যেন একজন ভালো মানুষ, সৎলোক হয়, শুধু নিজের জন্য নয়, বাহিরের জন্যো কিছু ভাবতে হবে, সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবে; লোকশিক্ষা পরিষদের মধ্য দিয়ে বড়ো মহারাজ মহিলা তথা ছাত্রীদেরও উন্নতির কথা ভেবেছেন। অশোক মহারাজের কথায় " সত্তা হিসেবে ওনার কোনো অস্তিত্ব নেই, তিনি রামকৃষ্ণ মতের পথপ্রদর্শক হিসাবে একজন, তিনি তো আর ইচ্ছামত বলতে পারেন না।" সময়ের সাথে স্থান, কাল পাত্র এগুলি পরিবর্তন হয়ে যায় সেইরকমই নরেন্দ্রপুরের, ছাত্র, মানুষ সবই পালটে যাচ্ছে। কেউ আরও ভালো হয়েছে। হয়তো কাজের সূত্রে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনকে মেয়র, মন্ত্রী এদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় কিন্তু কোনোভাবেই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে না। স্বাধীনতার কয়েকবছর পর তৈরী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কোনো আন্দোলন বা দাঙ্গার ছাপ দেখেননি মহারাজ। দেশভাগের পর বাংলাদেশের থেকে অনেক ছাত্র পড়াশোনার জন্য নরেন্দ্রপুরে এসেছে ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বা অর্ন্তদেশীয় জটিলতা ছিল না। তবে কিছু সমস্যা থাকে যেমন বাহিরে থেকে বলা হয় নরেন্দ্রপুরে কম ছাত্র ভর্তি হয় কিন্তু হিসাবমত অনেক ছাত্রই পড়াশোনা করে এমনকি আমরা দেখতে পাই এই সময় প্রার্থনা সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ এসমস্ত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন গুলি অবলুপ্তির পথে কিন্তু মহারাজের কথায় রামকৃষ্ণ মিশন টিকে থাকতে পেরেছ তার কারন রামকৃষ্ণ মিশন শুধুমাত্র একটা Institution হিসেবে গড়ে ওঠেনি, রামকৃষ্ণ মিশন একটি Brand Centre হিসাবে গড়ে উঠেছিল[৫]।

## সৌর্ন্দসনান্দজী মহারাজঃ

মহারাজের সাথে প্রথম কথোপকথন হয় ৮ ই ডিসেম্বর ২০১৮। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অফিস বিল্ডিং-এ।

মহারাজের বর্তমান বয়স প্রায় ৬৩ বছর এবং তিনি প্রায় ১১ বছর লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের সাথে ছিলেন। ১৯৭৯ সালে মহারাজ লোকেশ্বরানন্দজীকে প্রথম দেখেন। প্রথম দেখাতেই লোকেশ্বরানন্দজীর চেহারায় ও মার্জিত কথাবার্তায় সৌন্দর্সনান্দজী মহারাজ এককথায় খুব অভীভূত হয়েছিলেন। লোকেশ্বরানন্দজীকে তিনি কোনো সংস্কারক বলতে রাজী নন বরং লোকেশ্বরানন্দজী স্বামীজীর ভাবধারা অনুযায়ী শিক্ষাজগতে এবং সমাজে অনেক কাজ করেছেন, লোকেশ্বরানন্দজী বিদেশে, দেশের মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন এবং সেখানে তিনি রামকৃষ্ণ এবং বেদান্ত ভাবনা নিয়ে অনেক বক্তৃতাও দিয়েছেন। তিনি এইভাবে শিক্ষার সাথেধর্মকে মিশিয়েছিলেন। মহারাজের একটি বাণী যা তাঁকে বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছিল তা হল'কাজের ক্ষেত্রে একটি মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো', রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত শিক্ষাকেই তিনি নরেন্দ্রপুর মিশনের একটি ছাঁচে বসিয়েছিলেন যেখানে যারা শিক্ষার সুযোগ পায় না অর্থাৎ নিচু শ্রেণীর মানুষ থেকে সমাজের উঁচু তলার মানুষ পর্যন্ত সকলকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। স্বামীজী যেভাবে একজন প্রকৃত মানুষ হওয়ার কথা বলতেন। লোকেশ্বরানন্দজী ঠিক সেইভাবে মানুষ হওয়ার কথা বলতেন; আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হবে না, সবার জন্য ভাববে, মহিলাদেরকে তিনি আলাদাভাবে দেখতেন না। বিশেষভাবে দানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে সমানভাবে দান করতেন। লোকেশ্বরানন্দজীর চিন্তাভাবনা এবং ভাবধারা বর্তমান সমাজে খুবই প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। বর্তমান নরেন্দ্রপুর মিশন সেই ৫৮'র আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছে কিনা সত্যিই মহারাজের কাছে একটি বিতর্কিত বিষয়। তাও তিনি বললেন; এই প্রশ্নের উত্তর সমাজ দেবে এবং এটি একটি Endless Continuous Process'যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এবং উন্নতির ক্ষেত্রে টাকা এবং অনুদান প্রয়োজন। এগুলির জন্য প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সাথে যুক্ত থাকতেই হয় ঠিকই কিন্তু তা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে

নয়। তাঁর মতে, লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ যে জাতি ধর্ম একেবারে মানতেন না একথা বলা ঠিক নয় বরং বলা যেতে পারে তিনি প্রাধান্য দিতেন না[৬]।

**কানাই চন্দ্র মন্ডলঃ** কানাই চন্দ্র মন্ডলের এর সাথে প্রথম বাক্যালাপ হয় ১৫ই ডিসেম্বর২০১৮ সালে তাঁর বাড়ীতে। কানাই চন্দ্র মন্ডল বর্তমানে নরেন্দ্রপুরের একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন।

কানাই চন্দ্র মন্ডল বর্তমানে নরেন্দ্রপুরে কলেজের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর বর্তমানে বয়স ৬৭ বছর। তিনি ১৯৬৯ সালে প্রথম লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে দেখেন। ৬৯ থেকে ৭৩ দীর্ঘ চার বছর উনি মহারাজকে সেক্রেটারি হিসাবে পেয়েছেন। তাঁর মতে, মহারাজ  শিক্ষার পাশাপাশি মানুষজনের ও উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমের দিকে এটি একটি ছাত্রাবাস ছিল রিফিউজিরা এখানে থেকে পড়াশোনা করত। আধ্যাত্মিক জগতের দিক থেকে মহারাজ খুব উন্নত মানের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মতো শিক্ষকদের ও সদ্ব্যবহার ও ভালোবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতেন। ১৯৭০ সালে যে বন্ধ্ হয়েছিল মিশনে তা তিনি কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। স্যারের মতে, লোকেশ্বরানন্দজীর ব্যক্তিত্ব এবং পরিচালনা ক্ষমতার জন্য অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পিছনে ফেলে মিশন অগ্রগতি লাভ করেছিল। মহারাজজী কর্মীদের সাথেওনিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। মহারাজ এই মিশনকে বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ছাঁচে সাজিয়েছিলেন যেখানে গুরুর সাথে ছাত্র থাকতে পারে।। অর্থাৎ গুরুকুলীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। মহারাজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেক মুসলিম ছাত্র সন্ন্যাস নিয়েছিল। মহারাজের মনে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, বর্ণভেদ নিয়ে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন তাদের অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান করে ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্য নয়।

কানাই চন্দ্র মন্ডলের কথায়, বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন পূর্বের আদর্শ থেকে একটু হলেও বঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে আগে নরেন্দ্রপুরে যে গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে একটা মেলবন্ধন ছিল বর্তমানে সেটা  আর দেখা যায় না। বাহিরের মানুষজন মহারাজকে কোনোদিন প্রশাসক হিসেবে দেখাননি, তাদেরই শুভাকাঙ্খী এক মানুষ হিসাবে দেখেছে।মহারাজও আড়াপাঁচ, জগদ্দল প্রভৃতি এলাকার মানুষজনকেও খুব ভালোবাসতেন ও সাহায্যও করতেন। মহারাজ কখনই পুরুষ ও মহিলাদের বিভেদ করতেন না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও অংশগ্রহণ করতে পারতো। আমরা দেখতে পাই বেশকিছু ক্ষেত্রে লোকেশ্বরানন্দজীর কর্মজীবনে বেলুড়মঠ তাঁর সঙ্গ দেয়নি হয়তো তার কারণস্বরূপ তিনি বললেন, বেলুড় সমস্ত সন্ন্যাসীদের সমষ্টিগত একটি প্রতিষ্ঠান যদি কোন একজন সন্ন্যাসী বিশেষভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাধান্য পেতে শুরু করে তাহলে হয়তো তাঁদের একটাসমস্যা হতে পারে। দেশভাগের সময় অনেক রিফিউজি ক্যাম্পে, শরনার্থী শিবির-এ ত্রানকার্য মহারাজের উদ্যোগে হয়েছে। এসবের জন্য দেশীয় বা অন্তর্দেশীয় কোনো সম্পর্ক ছিল না। এমনকি তিনি তার আশেপাশের মানুষকে দান –ধ্যান, সাহায্যও করতেন[৭]।

## আব্দুস সামাদ গায়েনঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজেই আব্দুস সামাদ গায়েনের সাথে আলোচনায় বসি ২১শে ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে।

আব্দুস সামাদ গায়েন ১৯৭৫ সালে নরেন্দ্রপুরবিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভির্তি হয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে ৫৩ বছর অতিক্রান্ত। তিনি বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসাবে কর্মরত। তিনি বলছেন, ১৯৭৩-এ যখন তিনি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র তখন তিনি লোকেশ্বরানন্দজীকে প্রথম দেখেন। তিনি মহারাজের চেষ্টায় নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি

হয়েছিলেন। পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ যিনি নির্মল হাসি দিয়ে প্রাণের গভীরে প্রবেশ করতে পারে – মহারাজকে প্রথম দেখে এমনটা মনে হয়েছিল। সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি মহারাজের অযাচিত ভালোবাসা , স্নেহ পেয়েছিলেন। একটি ঘটনা তাঁর খুব মনে পড়ে ১৯৭৯ এ নরেন্দ্রপুরের একটি অনুষ্ঠানে তিনি যখন রাজ্যপালের কাছে পুরস্কার নিচ্ছিলেন তখন লোকেশ্বরানন্দজী তাঁকে নিয়ে একটি Introduction দেন কীভাবে এই ছেলেটির সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। আব্দুস সামাদ গায়েনের কথায় বড়ো মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন এখানেই থামলে হবে না, তোমাকে এবার অনেক দূর যেতে হবে। 1991 এ যখন প্রথম পুরুলিয়ায় চাকরি পান তখন তিনি মহারাজকে বলেন মহারাজ শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আমার তিনটি দাবী আছে।

**প্রথমত,** তুমি আমাদের নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাম্বাসাডার হয়ে সেখানে যাবে। তুমি ওখানকার প্রতিটি থানা ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষকে দেখবে।

দ্বিতীয়ত, ওখানে আমাদের একটি আশ্রম আছে, স্কুল আছে-তুমি ঘুরে দেখো, শিক্ষক হিসাবে তোমার যেন ব্যক্তিগত একটা কেরিয়ার থাকে।আব্দুস সামাদ গায়েন যখন পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানকার মানুষদের দেখেছেন, তাঁদের জীবনযাত্রা দেখে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। যেনো পৃথিবীর মধ্যেও আরও একটা পৃথিবী আছে। 1993 সালে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতায় শতবর্ষের অনুষ্ঠানে আব্দুস সামাদ গায়েনকে লোকেশ্বরানন্দজী যুব প্রতিনিধি হিসাবে ঠিক করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি স্বামীজীকে নিয়ে কিছু বললেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁকে আদর অ্যাপ্যায়ন করলেন এবং তাঁকে 'Message of Prophet' বইটি উপহারও দিয়েছিলেন। বড়ো মহারাজ পরে তাঁকে কোয়রর্টারে থাকার ও ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু তাঁর ঐ বক্তৃতা নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠেছিল কিন্তু লোকেশ্বরানন্দজী তাঁকে বলেছিলেন তুমি তোমার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীজীকে দেখেছো এতে ভুলের কিছু হয়নি। স্বামীজীকে বা অন্যকোনো মহান ব্যক্তিকে তাঁর

ভক্তমন্ডলী যখন ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করে দুর্ভাগ্যক্রমে ভক্তের বিচার বিশ্লেষণ ই দৃষ্টিতে একটা পর্দা পড়ে যায়। সেটা সাধারণ সমালোচক বিশ্লেষকের থাকার কথা নয়। তোমার ব্যখ্যা তাই কোনো ভক্তের মনে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু তুমি তোমার ভাবনাতেই থেকো যদি কখনো তোমার ভিতর থেকে মনে হয় তোমার মূল্যায়নে ঠিক ছিল না তখন বোলো। সেটা ভূল নয়, অনুরাগের পর্দা। তিনি বলছেন তিনি অনেক Social Studies এর মানুষের সাথে কথা বলেছেন কিন্তু এমন গবেষণামূলক কথা অন্যকেউ বলেননি। আব্দুস সামাদ গায়েন একজন হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন মহারাজ এবং সেটাও খুব হাসি মুখে মেনে নিয়েছিলেন এবং দূর থেকে সে সমস্ত লোকজন এসেছিল গোলপার্কে তাদের থাকার ও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। লোকেশ্বরানন্দজী'র সময়ে তিনি ছাত্রজীবনে নরেন্দ্রপুরে মহারাজের উদ্যোগে নামাজ পড়েছিলেন তাঁর জন্য বাংলায় কোরান আনানো হয়েছিল এবং রোজাও করেছিলেন। তাঁর কাকা মহারাজকে অভিযোগ করেছিলেন ছেলেটিকে দিলাম মানুষ হবার জন্য, আর সে কিনা নাস্তিক হয়ে গেল। তখন মহারাজ বলেছিলেন – নাস্তিক হবে কেন ? ও অনেক গরীব মানুষকে দেখছে, ও ওর উত্তর খুঁজছে। মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন 'স্বামীজীর কথায়, জীবনে কিছু ভুলো না, জীবনে অন্ততঃ একটা দাগ রেখে যাবে মহৎ কাজের।

এবার আসা যাক লোকেশ্বরানন্দজীর সৃষ্টি নরেন্দ্রপুরের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি। এই শিক্ষা প্রধানত মানুষ গড়ার শিক্ষা। তাঁর কথায় নরেন্দ্রপুরে একটি গরীব ছাত্রের সাথে একটি বড়ো ঘরের ছাত্র একসাথে থাকত সেখানে কোনো বিভেদ থাকত না এবং আরেকটি বিষয় হল কাজের কোন বিভেদ হবে না, সব কাজই আমার। আরেকটি বিষয় হল পরিবেশ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়া। কথা প্রসঙ্গে তিনি সুনীল মহারাজের কথা বললেন যিনি সাঁতার ব্যায়াম ইত্যাদি শেখানোর সাথে সাথে একদিন করে বিভিন্ন ধরণের গাছ চেনাতেন, রাতের তারা

চেনাতেন, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যা হল সেবাধর্ম, যা প্রাত্যহিক জীবনে প্রার্থনা থেকে নয়, রোজকার স্কুল জীবন থেকে নয়। নৈতিক জীবনে বাস্তব সমাজের সাথে অনেক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় – সামাজিক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক উচিত অনুচিত অনেক দ্বন্ধ অনেক কিছু আমাদের জীবনকে ঘিরে রাখে। নরেন্দ্রপুরের পরিবেশে কিন্তু এসবের প্রশ্ন ছিল না বললেই চলে। বিশেষ করে কলেজ জীবনে অনেক প্রশ্ন আসলেও আসতে পারে। আশ্রমে থাকাকালীন একটি ছাত্র যখন বাহিরের জগতের সাথে পরিচয় ঘটাতে চায় তখন অনেক প্রশ্নের সাথে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়।

আব্দুস সামাদ গায়েনের কাছে লোকেশ্বরানন্দজী শিক্ষাসংস্কারের পাশাপাশি তিনি একজন সমাজ সংস্কারক বটে তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টার ও লোকশিক্ষা পরিষদ, যার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের শিক্ষার বিস্তার এবং সার্বিক উন্নতি সম্ভব। লোকেশ্বরানন্দজীর ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক চিন্তাধারা বর্তমান সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন এ দেশকে তথাকথিত সেকুলারিজম বনাম কমিউনালিজম এর বিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে হবে না। একেবারে সমাজের নীচের তলার মানুষের কাছে গিয়ে প্রকৃত ধর্মভাব,সম্প্রদায়গতভাবে নয় এবং সম্প্রীতি সৃষ্টি করা এবং এটা সম্ভব হবে যখন পরস্পর পরস্পরকে জানতে পারবে। তিনি1983-র পর থেকে নরেন্দ্রপুর থেকে চলে এসেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি বলেছেন লোকেশ্বরানন্দজীর তৈরী নরেন্দ্রপুর যে ভাবধারা নিয়ে তৈরী হয়েছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছরে তা অনেক পরিবর্তন হয়েছে আর তা হওয়াটাও স্বাভাবিক। যেটা চোখে পড়ার মতো শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্লোবালাইজেশনের ফলে কেরিয়ার সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চলে এসেছে।

বর্তমানে আমরা দেখি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন সারদা মঠমিশনের জন্য অনেক রকম কাজকর্ম করে থাকে। কিন্তু পুরুষ ও মহিলাদের বিভেদটা নরেন্দ্রপুর মিশন বর্তমানেও বজায়

রেখে চলেছে।কিন্তু গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টার-এ নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করে থাকে। নরেন্দ্রপুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু তারা কোনো দলীয় স্বার্থে বা রাজনৈতিক স্বার্থে আসেননি। তারা হয়তো অতিথি হিসাবেই আপ্যায়িত হয়েছেন। লোকেশ্বরানন্দজীর যে বাণী তাঁকে বেশী আপ্লুত করে তা হল 'তুমি চেষ্টা করলে তুমি পারবে, দেশটাকে ভুলোনা, এই  দেশটাই আমার আসল দেশ,ভারতবর্ষ,' পড়াবে ঠিকই কিন্তু কেরিয়ার সর্বস্ব হয়ে উঠো না, সমাজকে দেখবে[৮]।

## উৎপল ভট্টাচার্যঃ

উৎপল ভট্টাচার্যের সাথেপ্রথম বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮–তে তাঁর বাড়ীতে।

স্যারের বাড়ি রাজপুর ফাঁড়ির কাছাকাছি। স্যারের বর্তমান বয়স ৭০ বৎসর। উৎপল ভট্টাচার্যের নরেন্দ্রপুর কলেজ জীবন ছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫। বর্তমানে তিনি একজন IAS Officer।তাঁর প্রথম দেখায় লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ছিলেন খুব Impressive, দর্শনধারী, ব্যক্তিত্ববান এক সন্ন্যাসী। তাঁর মতে, মূলত শিক্ষার জন্যই যে লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন তৈরী করেছিলেন তা নয় মানুষের উন্নতি ও সেবা করাও ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন নেতাস্বরুপ এবং কৃষ্ণময়ানন্দজী বা কুবের মহারাজ ছিলেন সৈনিক, কুবের মহারাজ ছিলেন পরিশ্রমী, সচেতন এবং নিয়মানুবর্তীতার ধারক। লোকেশ্বরানন্দজীর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা একটি জটিল বিষয়, আদতে তিনি তো হিন্দুই ছিলেন। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মীয় ব্যবহারে তিনি একটু হতাশা পোষণ করলেন। মহারাজ বুঝতে পারতেন কোন ছেলে ধর্মীয় পথে আসবে? তাঁকে সেভাবেই পথ দেখানো হত কিন্তু যারা ধর্মীয় পথে আসতে চাইত না তাদের তিনি

discourage ও করেননি আবার encourage ও করেননি। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব নরেন্দ্রপুর স্কুলের ছাত্রজীবনে কিছুটা দেখা গেলেও কলেজ ছাত্রদের মধ্যে একেবারেই তার কোনো প্রভাব পড়েনি। লোকেশ্বরানন্দজী প্রচন্ড ভালো বক্তা ছিলেন এবং নরেন্দ্রপুরে নয় এমনকি বেলুড়মঠে ও তাঁর খুব অবদান ছিল। তবে তাঁর মনে হয়েছে লোকেশ্বরানন্দ-র সাথে রামকৃষ্ণ মিশনের কোথাওএকটা হয়তো সমস্যা ছিল কারণ তাকে ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্য করা হল না আবার মহারাজের মৃত্যুতে বেলুড় মঠ মিশন বলেছিল কোনো শোকসভা হবে না কিন্তু এগুলোর কারণ কি ? তা উৎপল ভট্টাচার্যের কাছে আজও অজানা । লোকেশ্বরানন্দজীর সাথে সি.পি.এম এবং কংগ্রেসের খুব সংঘাত ছিল কিন্তু তা তিনি দমন করেছিলেন খুব কঠোর হাতে। তবে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ও রাজনীতি দু'জনেই মনে করে প্রত্যেকে প্রত্যেককেই ব্যবহার করছে। এছাড়াও মহারাজ সমাজের জন্য অনেক কিছুতেই করেছেন কিন্তু মহারাজ সহ কিছু মানুষজনের মাদার টেরেজা বা মাদার টেরেজার কাজকর্মের উপর খুব negativereaction ছিল। আগে যদিও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে মহিলাদের আনাগোনা একেবারেই দেখা যেত না কিন্তু বর্তমানে তা একটু লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন যেটুকু কাজ করেছে তার মূল্য অতুলনীয়। মহারাজের তৈরী নরেন্দ্রপুরে আগে গরীব ছাত্রেরা বেশী পড়ত এবং তাদের সাথে বড় লোকের ছাত্রেরাও পড়াশোনা করত, একই সাথে ছোট-বড় সব কাজ করতে হত সবাইকে এবং সেখান থেকেই আসত শিক্ষা কিন্তু বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে উঠছে বড় লোকেদের প্রতিষ্ঠান। এপ্রসঙ্গে তিনি বনোভা ভাবীর কথা বললেন, সে সময়ে তাঁরা তাঁকে খাইয়েছেন, তাঁর সাথে থেকেছেন, ঘুরেছেন এক্ষমতা শুধুমাত্র লোকেশ্বরানন্দজী বলেই সম্ভব ছিল। উৎপল ভট্টাচার্যের শেষ কথা হল লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের অবিশ্বাস্য রকমের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল, যা একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী ছাড়া থাকা সম্ভব নয়[৯]।

# সুনীল বরণ পট্টনায়কঃ

সুনীল বরণ পট্টনায়কের সাথে আলাপ-চারিতা ও বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ৪ই জানুয়ারী ২০১৯ সালে ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির অফিস ঘরে।

তিনি লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে প্রথম দেখেন ১৯৬৩ সালের ৭ই আগষ্ট। মহারাজকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন সৌম্যকান্তি দর্শন। তেমনি লম্বা। সেই ভর্তি থেকেই বড়ো মহারাজ প্রতিটি ছাত্রের উপর নজর রাখতেন। তবে তিনি কোন ছাত্রের দৈনন্দিন জীবনে বা ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি পুঁথিগত শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না এবং খুব নিয়মানুবর্তিতার কথা বলতেন অর্থাৎ পড়ার সময় পড়তে হবে এবং খেলার সময় খেলতে হবে। কলেজের ক্ষেত্রে ১১টার পর ঘরের আলো বন্ধ হলেও স্টাডি ঘরের আলোর ব্যবস্থা ছিল সেখানে ১২ টা পর্যন্ত আলো জ্বলত যাতে ছাত্ররা পড়তে পারে। লোকেশ্বরানন্দজীর মতে, শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্মও করতে হবে। সেইমতো পাশাপাশি গ্রামগুলির মানুষদের ছাত্ররা তথা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন অনেক সাহায্য করে থাকত। তিনি কোন ছাত্র বা কোনো মানুষকে সরাসরি সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলতেন না বা সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য জোরও করতেন না। সবার সাথে মহারাজের এক মধুর সম্পর্ক ছিল। মহারাজের এই সম্পর্ক, প্রেম, ভালোবাসা শুধু সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই ছিল না, পশু-পাখীর মধ্যেও তা বিরাজমান ছিল। মহারাজের তৈরী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন-এ এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক একসাথে থাকবে এবং শিক্ষা হবে অনুসরণীয়, অনুকরনীয়। স্বামীজীর সেই বার্তা ‘Manifestation of the perfection already in men’-কে সামনে রেখে, বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটানোই ছিল মহারাজের লক্ষ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহারাজ কিন্তু অনেক বিদুষী মহিলা, সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের আহ্বান ও জানাতেন।তাঁর মতে, বড়ো মহারাজের চিন্তাভাবনার কোনোখামতি ছিল না,মহারাজের চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের

পূর্ণ বিকাশ, মানুষের ভিতরের অর্ন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। আজকের দিনেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। সেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবাহমানতার প্রধান কারণ হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সমাজের সার্বিক কল্যাণে খুবই কার্যকর ছিল। কোথাও কোনও সংকীর্ণতা ছিল না। লোকেশ্বরানন্দজীর যে হৃদয়বত্তা, উদারদৃষ্টিভঙ্গি তা সহজলভ্য নয়। মহারাজের শরীর যাওয়ার পর থেকে নরেন্দ্রপুর মিশনের কাজকর্ম অনেক বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আশ্রম কর্তৃপক্ষের সাথে আশ্রমিক বা কর্মীদের একটা টানা –পোড়েনও বেড়েছে। সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য, সরকারি সাহায্যের জন্য সরকারি পরিচালক বর্গের সাথে সুসম্পর্ক রাখার জন্য নরেন্দ্রপুর মিশন ওদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের আহ্বান করে থাকে। লোকেশ্বরানন্দজী ভাবনার মূল কথাই ছিল 'সুন্দরভাবে জীবনযাপনের কথা' তবে নরেন্দ্রপুরে বড়ো মহারাজ ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা খুব একটা বেশি করেননি[১০]।

## সত্যনারায়ন সরকারঃ

সত্যনারায়ন সরকারের সাথে আলোচনার দিনটি ছিল ১০ই জানুয়ারী ২০১৯ তাঁর বাড়ীতে।

সত্যনারায়ন সরকারের বর্তমান বয়স ৭৩ বছর। বর্তমানে তিনি মন্দির গেটের একটি অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করেন। ১৯৬০ সালে লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর চোখে দেখা এই প্রথম সন্ন্যাসী যিনি ঘরেও থাকেন [গৃহী], পড়াশোনাও করেন আবার মানুষের সাহায্য করেন। তিনি লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের সাথে থেকে কাজকর্ম করেছেন। তিনি প্রকৃত অর্থে ছিলেন একজন 'Educator' অর্থাৎ উনি নিজেও লেখাপড়া করতেন এবং  অনেক বইও লিখতেন যাতে ওনার লেখা বই পড়ে মানুষ মানুষের সেবা করতে

পারে। মহারাজের চিন্তাধারার পদ্ধতি হল মানুষটি আগে কি খাবে, তারপর কোথায় সে থাকবে তারপর আসবে শিক্ষার উন্নতি। সেই সময়কালে প্রতিষ্ঠালব্ধ ব্রাহ্মসমাজের লোকজন ছিল শুধুমাত্র উঁচুতলার শিক্ষিত মানুষজন কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ছিল সর্বস্তরের মানুষদের জন্য। এইজন্যই ব্রাহ্মমসমাজ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশন কিন্তু কোন জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ মানে না অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রামের এক সংকীর্ণ পরিবেশে মানুষ হয়েও তিনি বেদান্ত ভাবনাকে তুলে এনেছেন যে 'মানুষ এক'। মহারাজ তিনি তাঁর সাথে থাকা মানুষদের সবসময় কিছু না কিছু শিক্ষা দিতেন। মহারাজ সবসময় সমাজের নিচুতলার মানুষদের কথা খুব ভাবতেন এবং তিনি যা বলতেন, সেটা করারও চেষ্টা করতেন। সত্যনারায়ন সরকারের কাছে নরেন্দ্রপুর মিশনের হোস্টেল কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে খুবই যুক্তিযুক্ত। লোকেশ্বরানন্দজী বলতেন বিদেশে গিয়ে চাকুরি করতে পারো কিন্তু কাজ তোমাকে দেশে এসেই করতে হবে।, এবং কোনো ছাত্র সন্ন্যাস নিতে চাইলে তাকে তিনি অনেক বিবেচনা করে তবেই সন্ন্যাস দিতেন। মহারাজের চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী বর্তমান সমাজে খুবই প্রাসঙ্গিক ও শাশ্বত বলেই মনে করেন সত্যনারায়ন সরকার। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা লগ্নে মহিলাদের কোনো গুরুত্ব দেয়া হত না কিন্তু লোকশিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর মহিলারা নরেন্দ্রপুরে একটি স্থান পায় ঠিকই কিন্তু পুরুষ ও মহিলার বিভেদটা সেখানে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সারদা মঠ-মিশনে কিন্তু কোনো সন্ন্যাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কোনো দলীয় স্বার্থ মেনে চলে না কিন্তু সরকারকে মেনে চলে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কে মানে, খুবই মজার একটি বিষয় সংবিধানে আছে যে, যে সন্ন্যাসীরা ভোট দিতে পারে কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো সাধুই ভোট দেয় না। স্বামীজী কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে কোনরকম রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন এবং যার জন্যই নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ নিবেদিতা বলেছিলেন 'আমি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেভাবেই হোক সাহায্য করবই।' ১৯৭০ সালে ছাত্র-শিক্ষকরা একসাথে মিলেমিশে কাজ করে নরেন্দ্রপুরের 'বন্ধ্' কে রক্ষা করেছিল মহারাজের নেতৃত্বে। কিন্তু ভবিষ্যতে মহারাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার ছেলেদেরও কিন্তু নরেন্দ্রপুর মিশনে ভর্তি নিয়েছেন। এছাড়াও আরেকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে মহারাজের হৃদয়ের কথা বোঝা যায় তা হল ত্রাণকার্য। বণ্যাত্রাণের সময় মহারাজ গরীব-দুস্থদের, পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, যেভাবে তাঁদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তা কখনই ভুলবার বিষয় নয়[১১]।

## চন্দন কুমার দাসঃ

চন্দন কুমার দাসের সাথে কথোপকথোনের দিনটি ছিল ১৬ই জানুয়ারী ২০১৯-এ তাঁর ফ্ল্যাটে।

চন্দন কুমার দাস বর্তমানে মন্দির গেটের একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। তিনি নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বর্তমান বয়স ৭৩ বছর। তিনি যেহেতু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ছাত্র অর্থাৎ তিনি ১৯৫৮ সালে ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রপুর মিশনে ভর্তি হয়েছিলেন এবং মহারাজকে প্রথম থেকেই দেখেছেন এবং মহারাজকে প্রথম দেখে স্যারের মনে হয়েছিল এ মানুষ সাধারণ মানুষ নন, যার একটু কথাতেই মন গলে যায়। মহারাজ বলতেন, 'উদ্দেশ্য মহৎ হলে কোনো দিনই বিপদে পড়বে না, কোনো কাজই বিফলে যাবে না'। মহারাজ সবসময়ই ছাত্রদের সাথে থাকতেন এবং খেয়াল রাখতেন। শিক্ষকদের সাথে দাদা-ভাইয়ের মতো এক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কেরিয়ার ছাড়াও হয়তো আরও অনেক কিছু পাওয়া যায় যা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। মহারাজ নরেন্দ্রপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে যাতে সমাজেরও উন্নতিসাধন করা যায়। তিনি বিশেষ করে  ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির কথা বলেছেন যা শুধু ভারতে শ্রেষ্ঠ নয়, পৃথিবী

বিখ্যাত। তাঁর মতে, ওই সময়ের অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্রাহ্মসমাজ, ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘএগুলি প্রায় বন্ধের মুখে কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন টিকে থাকতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ হল অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্রই ধর্মের জোর দিয়েছিল। নরেন্দ্রপুর মিশনে শিক্ষার পদ্ধতি বাহিরের শিক্ষা পদ্ধতির থেকে অনেকাংশে আলাদা কারণ নরেন্দ্রপুরে শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, উপনিষদ পাঠ করা হয় এবং 'Indian Culture' নামে একটি বিষয় পড়ানো হয় যা একটি ছাত্রের চারিত্রিক পরিবর্তন আনতে পারবে। তাঁর মতে, চরিত্র তৈরী না হলে মানুষ তৈরী হয় না। লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন বিবেকানন্দ-নিবেদিত প্রাণ অর্থাৎ বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথকে তিনি মেনে চলতেন, যার মূল কথা 'একজন প্রকৃত মানুষ তৈরী হও,' স্বাধীনতার পর অথবা দেশভাগের পর কোনো প্রভাব সরাসরিভাবে নরেন্দ্রপুরে না পড়লেও উদবাস্তু ছেলেরা কিন্তু নরেন্দ্রপুরে এসেছে পড়াশোনার জন্য। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী যে আদর্শ নিয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন তৈরী করেছিলেন বর্তমানেও সেই আদর্শ ধরে রাখতে পেরেছে এই মিশন। তবে বর্তমানে এই মিশন একটু হলেও বড়লোক ঘেঁসা হয়েছে এবং ছাত্রদের জন্য অনুদান ও Scholarship পাচ্ছে। কিন্তু নরেন্দ্রপুর মিশন কোনোভাবেই রাজনীতির সাথে যুক্ত নেই। মানুষ গড়ার দিক থেকে মহারাজ কিন্তু মহিলাদেরকেও পিছিয়ে রাখেননি, তৈরী করেছেন গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টার এবং লোকশিক্ষা পরিষদ। চন্দন কুমার দাসের মতে, স্বামীজী যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মূর্তি ঠিক তেমনিভাবেই লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের একটি জ্বলন্ত প্রতি মূর্তি। বিদেশে বহু রামকৃষ্ণ-মঠ-মিশন আছে এবং নরেন্দ্রপুর মিশনের বহু সন্ন্যাসী বিদেশে যায় ঠিকই কিন্তু আলাদা করে দেশীয় কোনো আইনত সম্পর্ক থাকে না তাদের সাথে[১২]।

# বিজয় বেরাঃ

বিজয় বেরার সাথে আলোচনার সূত্রপাত ২১ শে ডিসেম্বর ২০১৮ নরেন্দ্রপুর কলেজেই Exam Controller এর ঘরে।

বিজয় বেরার বর্তমান বয়স ৫৮ বছর এবং তিনিও স্বচক্ষে লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে দেখেছেন। বর্তমানে তিনি গড়িয়া কামডাহরি ব্যানার্জী পাড়ায় থাকেন। ১৯৭১ –এ তিনি প্রথম লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে দেখেন এবং তাঁর জীবনে দেখা এই প্রথম সন্ন্যাসী। তিনি এই বছরে নরেন্দ্রপুর কলেজের ছাত্র হিসাবে এসেছিলেন। তাঁর মতে, লোকেশ্বরানন্দজী একজন সাধু হলেও তিনি একজন দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। কখনোই তিনি কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। লোকেশ্বরানন্দজীকে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন পাঠানোর পিছনে প্রধান ও অন্যতম কারণ ছিল গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে যে ঝামেলা চলছিল তা অন্য কোনো মহারাজ সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। ১৯৯৮ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর লোকেশ্বরানন্দজী যখন নরেন্দ্রপুরে এসেছিলেন তিনি বলেছিলেন ‘আমি আমার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মানুষের ভালোর জন্য করে যাবো’। মহারাজ বাগানের মালী থেকে শুরু করে সবার সাথে সমানভাবে হাসিমুখে সমান ব্যবহার করতেন। লোকেশ্বরানন্দজীর শিক্ষার ধরন ছিল গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার মতো যেখানে ছাত্র থাকবে তার সাথে শিক্ষকও থাকবে। তিনি নরেন্দ্রপুরকে বলতেন ‘বাড়ির বাইরেও বাড়ী’, গ্রাম থেকে যে সমস্ত ছেলেরা আসত তারা নরেন্দ্রপুরে থাকত কিন্তু শহর থেকে আগের ছাত্ররা প্রতি সপ্তাহে বাড়ী চলে যেতো তবে বর্তমানে শহরের ছাত্র বেশী পরিমানে ভর্তি হওয়ার ফলে নরেন্দ্রপুরের পরিবেশ কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। নরেন্দ্রপুরের পরিবেশই ছাত্র ও শিক্ষককে পরিবর্তন হতে বাধ্য করে বাহিরের পরিবেশের থেকে। বিজয় বেরার মতে, জগতে খারাপ-ভালো দুটোই আছে কিন্তু নরেন্দ্রপুরের ছাত্ররা এর মধ্যে ভালোটাকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। ভেঙ্গে দিলে তো সব কিছু শেষ হয়ে গেল তাকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করো।

এতদসত্বেও গ্রাম ও শহরের ছেলেদের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকত সেটা সহজে বোঝা যেত না। লোকেশ্বরানন্দজীর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা স্বামীজীর চিন্তাধারার পথে ধাবিত হয়েছিল যা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল মানুষকেন্দ্রিক। ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে সেবা করা ইত্যাদিকে তিনি পূজা হিসেবে নিতেন। নরেন্দ্রপুরের ধ্যান, জপ, ঈশ্বরকে ডাকার জন্য নয় নিজেকে সংযত করার জন্য। লোকেশ্বরানন্দজীর মতে যা কিছুই করবে ভালোবাসা দিয়ে করবে। ৭০'র দশকে সরকারের যদি কোনো বিদেশী অতিথি কলকাতায় আসত তারা অবশ্যই একবার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আসত। বামপন্থী কিছু ঝামেলা ছিল নরেন্দ্রপুরে এই সময়ে। তাই বামপন্থী কোনো নেতা এই সময়েনরেন্দ্রপুরে আসেনি। কিন্তু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে তারা কোনো দুর্ব্যবহার করেনি। তবে বর্তমানে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। বিজয় বেরার মতে, লোকেশ্বরানন্দজীর সময় থকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের ভিতরের পরিবেশ বাহিরের সমাজের পরিবেশের থেকে অনেকাংশেই ভালো কিন্তু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কী পুরানো সেই আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছে এবিষয়ে তিনি কিছু বলতে চাইলেন না। তিনি বলছেন আজ পর্যন্ত পুরুষও মহিলা নিয়ে একসঙ্গে মিলে কোন সঙ্ঘ সফল বা উন্নতি হতে পারেনি তাই রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদা মঠ মিশনকে আলাদা করে তৈরীর পন্থা নেওয়া হয়েছিল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ছিল একজন ছেলে মানুষ হয়ে সে যেন তার বাবা-মা কে দেখে, তাঁর সংসারকে দেখে, পরবর্তী প্রজন্মকে যেন এগিয়ে আনতে পারে। তবে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশাসনিক পদে একটু গাফিলতি এসেছে। তবে বিজয় বেরারশেষ কথা 'লোকেশ্বরানন্দজী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনকে তৈরী করেছিলেন একজন মানুষকে ভালো মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য [১৩]।

# স্বামী পুরাতনানন্দজী মহারাজঃ

মহারাজের সাথে আলোচনা হয় ৩০শে জানুয়ারী ২০১৯ সালে  নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অফিসে।

বর্তমানে মহারাজের বয়স ৬৮, তিনিছিলেন নরেন্দ্রপুরের প্রথম ব্যাচ। মহারাজ, লোকেশ্বরানন্দজীকে প্রথম দেখেন ১৯৬৬ সালের ১২ইআগষ্ট। ১৫ই আগষ্ট খেলার মাঠে আরেকবার ভালোভাবে লোকেশ্বরানন্দজীকে দেখে একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসাবে মনে করেন তিনি। মাঝে মাঝেই ব্রহ্মানন্দ ভবনে দেখা হত তাঁরমহারাজের সাথে। লোকেশ্বরানন্দজী পরীক্ষার আগে হোস্টেলে গিয়ে খোঁজ নিতেন ছাত্ররা ঠিকমত পড়াশুনা করছে কিনা।মহারাজের M.Sc পরীক্ষার সময় ফর্ম ভর্তি করার দিন চলে গিয়েছিল তখন লোকেশ্বরানন্দজী একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন Vice Chancellor কে , তবে মহারাজ পরীক্ষা দিতেপেরেছিলেন। এই কথা স্মরণ করার সাথে সাথে মহারাজ নিজে কেঁদে ফেললেন। ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা এবং উদারতার দিকটা তাঁকেবেশি প্রভাবিত করেছিল, এরই আরেকটি ফলশ্রুতি ছিল ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি। এছাড়াও লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আশেপাশের গ্রাম ও মানুষজনদের নিয়েও ভেবেছেন তাঁদের জন্য তিনি তৈরী করেছিলেন গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টার ও লোকশিক্ষা পরিষদ। এছাড়াও তিনি কিন্তু উৎসব করেছিলেন। সেখানে শিশুরা আসত, এবং খাওয়া-দাওয়া করত। এ প্রসঙ্গে তিনি শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, নন্দদুলাল চক্রবর্তী'র কথা উল্লেখ করেন। লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ শুধুমাত্রই যে শিক্ষা, সমাজ নিয়েই পড়ে থাকতেন তা নয়, তিনি ব্রহ্মানন্দ ভবনের প্রার্থনা ঘরে ধ্যান করতেন, সময় দিতেন এবং ছাত্রদের অনেক মহারাজের জীবনী ও বাণী শোনাতেন। তিনি বলতেন আমাদের জীবনের ষোল আনার মধ্যে চার আনা ঈশ্বরকে দিলেই যথেষ্ট। তিনি চাইতেন ছাত্ররা যেন একজন নীতিবান মানুষ হয়। তাঁর চলাফেরা এবং কাজকর্মের পদ্ধতি সমাজে খুব প্রয়োজন। লোকেশ্বরানন্দজীর

তৈরী নরেন্দ্রপুর সে আদর্শ নিয়ে তৈরী হয়েছিল তরুন-মহারাজের মতে, নরেন্দ্রপুর এখনো সেই আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছে। তবে রাজনৈতিকভাবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কোনভাবে যুক্ত কিনা সে প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইলেন না মহারাজ[১৪]।

## নারায়ণ চন্দ্র দাসঃ

নারায়ণ চন্দ্র দাসের সাথে প্রথম দেখা করি ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে, ওনার বাড়ীতে। উনি এখন সোনারপুরের নিকটস্থ মিশনপল্লীতে থাকেন। বর্তমান বয়স ৭৮ বৎসর।

নারায়ণ চন্দ্র দাস প্রথম নরেন্দ্রপুরে আসেন ৯ই আগস্ট ১৯৫৭ সালে ছাত্র হিসাবে। তখন ছাত্ররা লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের অনেক কাজে সাহায্য করেছে। তবে মহারাজের এই বিশাল কর্মযজ্ঞে চারজন লেফট্যান্যান্ট ছিলেন-স্বামী আসক্তানন্দ, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। লোকেশ্বরানন্দজীর সৌম্যকান্তি দর্শন প্রথম দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। লোকেশ্বরানন্দজী নিজে দেওঘর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা ছিল মহারাজের। তিনি এম.সি.চাকলা,শ্রীমালী মোররজী দেশাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য প্রভৃতি বহু অতিথিদের আনতেনএবং এই সমস্ত উচ্চপদস্থ মানুষদের সাথে ছাত্রদের পরিচয় করাতেন। মহারাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সাথে সাথে উনি চরিত্র গঠনেরও নিয়মানুবর্তিতার ওপর জোর দিতেন। সকল স্তরের মানুষের সাথে অসম্ভব ধরণের ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন।মহারাজ শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁরমতে, আশ্রমের বাহিরে থেকে পড়াশুনা করলে ছাত্রটি আয়ত্ত্বের

বাহিরে। মহারাজ প্রত্যেকদিন জপ-ধ্যান করতেন ঠিকই, আসলে মহারাজ ছিলেন একজন প্রশাসক। তিনি গোলপার্কে যখন গিয়েছিলেন সেখানকার ঝামেলাও তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। মঠ-মিশনের নির্দেশ অনুসারে তিনি সারাজীবন কাজ করে গেছেন, নিজে হাতে তৈরী নরেন্দ্রপুর মিশনের প্রতি কোনো আসক্তি ছাড়াই তিনি নরেন্দ্রপুর ত্যাগ করেছেন। মহারাজ ছিলেন খুব ছাত্র-দরদী কিন্তু প্রয়োজনে তিনি শাসন ও করতেন আবার কেরিয়ারে যাতে আঘাত না পড়ে সেকথাও মাথায় রাখতেন। মহারাজ নিজে খুব পড়শোনা করতেন। তিনি খেলাধূলার প্রতি খুব উৎসাহী ছিলেন। সমাজের অনেক গরীব ছাত্রকে এনে বিনা পয়সায় পড়াশুনা করার সুযোগ করে দেন তিনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তুরা ভারতে এসেছিল, তদের জন্য মহারাজ খুব বড়ো কাজে নেমেছিলেন। তাঁর চোখে, লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেতা না হলেও সমাজকল্যাণে ও মানবজাতির উন্নতির জন্য উনি অবশ্যই একজন বড়ো মাপের নেতা।লোকেশ্বরান্দজী নরেন্দ্রপুর মিশনে থাকাকালীন সরাসরি কোনোদিন রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না। বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে গরীব লোকের তুলনায় বড়োলোকের ছেলেরাই বেশী ভর্তি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু গরীব ছাত্র ও বড়োলোকের ছেলে (ছাত্র) এর মধ্যের ভেদাভেদ নরেন্দ্রপুর মিশন আজও কিন্তু বুঝতে দেয় না, মহারাজ কোনদিনই জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন না। নরেন্দ্রপুর মিশন এর শুরুর দিকে শুধু পুরুষদের প্রাধান্যতা থাকলেও বর্তমানে সরাসরি গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টারের মধ্য দিয়ে নারীদের উন্নতির ও স্বনির্ভরতার চেষ্টা করা হচ্ছে।তাঁর মতে, অনেক ধনী প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে স্ত্রী-পুরুষ একসাথে থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়ে গেছে মহারাজ কিন্তু সেটা হতে দিতে চাননি; মহারাজের অসম্ভব রকমের ব্যক্তিত্ব ছিল। মহারাজের চিন্তাভাবনা বর্তমান সমাজে খুবই প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য কারণ কোন রাষ্ট্রই ধর্ম ব্যতিরেকে চলতে পারেনা। তাঁর মতে, সে  দুদিনেই ভেঙ্গে পড়বে। এই জন্য সমস্ত ধর্মের ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দিতেন।

তাঁর মতে যেটা সত্য বা চিরসত্য সেটা হবেই বা থাকবেই, হয়তো তখন সেটার প্রয়োগ হচ্ছে না কিন্তু  একদিন না একদিন তারপ্রয়োগ হবেই[১৫]।

## আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আলোচনায় বসি ২০১৯ সালের ১৭ ই জানুয়ারী। বর্তমানে তিনি বাণিজ্য ও পরিবহন মন্ত্রক। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫০ এর কাছাকাছি।

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম লোকেশ্বরানন্দজীকে দেখেন ১৯৭০ সালের শেষ দিকে যখন তিনি প্রথম নরেন্দ্রপুরে বিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন এবং তিনি ভর্তি হন ১৯৭১ সালে। তিনি তখন ছোটো ছিলেন কিন্তু তাঁর মনে আছে লোকেশ্বরানন্দজীকে দেখে তাঁর বাবার মহারাজের কাছে দীক্ষা নেওয়ার খুব ইচ্ছা জেগেছিল। মহারাজ ছিলেন লম্বা, দিব্যকান্তি, সবদিক থেকেই মনস্বীতার ছাপ। তখনকার রাজনৈতিক চরিত্র বলতে মিশনের  বাহিরে তখন বামপন্থী আন্দোলন হচ্ছে এবং অনেক শিবির করে কমিউনিস্টরা বসে ছিল। বাইরের আন্দোলন এবং  ভিতরের কর্মচারীদেরআন্দোলনের সাথে একটা যোগ গড়ে উঠেছিল। ১৯৭০-৭১ সালে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের পটভূমিতে একটি বিশৃঙ্খলার বাতাবরণে ছিল। লোকেশ্বরানন্দজী তখন নরেন্দ্রপুরের হাল খুব দৃঢ় হাতে ধরছিলেন। তার ভিতরটা অনেকটাই অনুশাসন, শৃঙ্খলার আধারে ধরা ছিল।  নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন খুব সচেতন ভাবেই প্রকট রাজনীতি থেকে দূরে থাকে সেরকম ভাবেই লোকেশ্বরানন্দজী এসব থেকে দূরে ছিলেন। এছাড়াও  তিনি বললেন মন্ত্রীরা নরেন্দ্রপুরে আসেন ঠিকই কিন্তু কোনো দলীয়ব্যাপার নিয়ে আসেন না। মহারাজের হাত থেকে চাকুরীজীবী অনেক ব্যক্তি ছাড়াও অনেক সন্যাসী তৈরী হয়েছেন যেমন শংকর মহারাজ গৌতম মহারাজ প্রভৃতি। এ বিষয়ে মহারাজের মনের মধ্যে কোনো সন্তোষ ছিল না।  নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে একটা পুরুষকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বিরাজ

করে কিন্তু মহিলাদেরকেও তারা দূরে সরিয়ে রাখে না সেটা লোকেশ্বরানন্দজীর গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টার এবং লোকশিক্ষা পরিষদের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। এ বিষয়ে লোকেশ্বরান্দজীর সাথে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন বেশী কথাও হয়নি[১৬]।

## হরি মহারাজঃ

হরি মহারাজের সাথে সাক্ষাতের দিনটি হল ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯।

বর্তমানে মহারাজের বয়স প্রায় ৭০। তিনি ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনে আছেন। তিনি বেশ কিছু বছর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তবে তাঁর খুবএকটা বেশি আলাপচারিতা হয়নি। তাঁর মতে, লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ একটি ছাত্রকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে মানুষ গড়ে তোলার কথা বলতেন। যার মধ্যে থাকবে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা। প্রত্যেকটি মানুষকে, প্রত্যেকটি ছাত্রকে ভালো করে বুঝতে হবে। এপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, ক্লাসে পড়াতে পড়াতে একটি ছাত্রঘুমিয়ে পড়েছে লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ বললেন ওকে ডাকো কিন্তু বোকো না। নিশ্চই ও খুব ক্লান্ত বা শরীর খারাপ, ওকে বোঝাও। আরেকটি ঘটনা তিনি বললেন। একবার একটি ছাত্র ফুল হাতা শার্ট হাত গুটিয়ে পরে আসছিল মহারাজের সাথে তাঁর মুখোমুখি দেখা হতেই মহারাজ বললেন ‘তোমার কি হাফ হাতা শার্ট নেই ? এই কথাতেই ছেলেটির শিক্ষা হয়েছিল। এছাড়াও লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ছাত্রদের ঠিক পথে চালনা করার জন্য সবসময় বলতেন। হরি মহারাজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বেশ কিছু ছাত্র সারা রাজ্যে প্রথম দশের মধ্যে বেশ কিছু স্থান অর্জন করেছিল। লোকেশ্বরানন্দজীর ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। যা ওনাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। তিনি একা হাতে দাঁড়িয়ে সমস্তকিছু পরিচালনা করতেন যেমন প্রশাসনিক দিকে

তেমনি শিক্ষার দিকেও। তবে শিক্ষার দিকেই তিনি বেশি জোর দিতেন। যাতে নরেন্দ্রপুর মিশনের ছেলেরা ছেলেটি প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে সমাজের কল্যাণ করতে পারে[১৭]।

# তথ্যসূত্রঃ-

## সাক্ষাৎকারঃ


১। প্রশান্ত কুমার গিরি (বয়স ৭০), নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ২২.১০.২০১৮, কলকাতা।

২। হরপ্রসাদ সমাদ্দার (বয়স ৭০), নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ৫.১১.২০১৮, কলকাতা।

৩। মহম্মদ কুব্বত বাগানী (বয়স ৮০), সাধারণ জনগণ, ১৪.১১.২০১৮, কলকাতা।

৪। শরদ কুমার মিরানী (বয়স ৭০), নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, ২২.১১.২০১৮,কলকাতা।

৫। সত্যাত্মানন্দজী মহারাজ (বয়স ৭০), মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যালয়ে কর্মরত, ৩০.১১.২০১৮, মেদিনীপুর।

৬। সৌন্দর্সনান্দজী মহারাজ (বয়স৬৩), নরেন্দ্রপুর মিশনের কার্যালয়ে কর্মর ৮,১২,২০১৮, কোলকাতা।

৭। কানাই চন্দ্র মন্ডল (বয়স ৬৭), নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ২২.১০.২০১৮, কলকাতা।

৮। আব্দুস সামাদ গায়েন (বয়স৫৩), প্রেসিডেন্সি মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক, ২১.১২.২০১৮, কোলকাতা।

৯। উৎপল ভট্টাচার্য (বয়স ৭০এর কাছাকাছি), অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস. কর্মকর্তা, ৩০.১২.২০১৮, কলকাতা।

১০। সুনীলবরণ পট্টনায়ক (বয়স ৭০), নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমিতে কর্মরত শিক্ষক, ০৪.০১.২০১৯, কলকাতা।

১১। সত্যনারায়ন সরকার (বয়স ৭৩), নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ২০.০১.২০১৯, কলকাতা।

১২। চন্দন কুমার দাস (বয়স ৭৩), নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ১৬.০১.২০১৯, কলকাতা।

১৩। বিজয় বেরা (বয়স ৫৮), নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের কর্মরত অধ্যাপক, ২৫.০১.২০১৯, কলকাতা।

১৪। স্বামী পুরাতনানন্দজী মহারাজ (বয়স ৬৮) নরেন্দ্রপুর মিশনের কার্যালয়ে কর্মরত, ৩০.০১.২০১৯, কলকাতা।

১৫। নারায়ন চন্দ্র দাস, (বয়স ৭৮)। নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ০৭.০২.২০১৯, কলকাতা।

১৬। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৫০), সরকারী বাণিজ্য ও পরিবহন বিভাগে কর্মরত মন্ত্রক, ১৭.০২.২০১৯, কলকাতা।

১৭। হরি মহারাজ (বয়স ৭০), নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের অসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, ২১.০২.২০১৯, কলকাতা।

# উপসংহার

স্বামী বিবেকানন্দ আপন প্রতিভা, মনীষা ও কর্মপ্রচেষ্টায় শ্রী রামকৃষ্ণদেবের যে ভাবকে বাস্তবায়িত করার পথ নির্দেশ করে গেছেন, সেই মহাভাবপ্রবাহের একটি বিশিষ্ট তরঙ্গ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ তিনি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্কর মন্তব্য করেছেন, "মোক্ষের সন্ধানে বেরিয়ে সর্বত্যাগী সন্নাসী যখন বিবেকের আহ্বানে কর্মযোগীতে পরিনত হন তখন সে কী অভাবনীয় সাফল্য আসতে পারে ইদানীংকালে তার বিস্ময়কর প্রমান রেখে গেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। মহারাজের ছিল বিবিধ গুন। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ও সংগঠক, সুপন্ডিত, সুলেখক, সুবক্তা এবং প্রকৃত শিক্ষক। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে মনে আসে তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসার কথা। সবার জন্য তাঁর হৃদয় উজার করা প্রেম, প্রীতি, করুনা, মমতা ও সহানুভূতির কোনো তুলনা মেলে না। হোস্টেলে পড়াশোনার জন্য কোনো ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে, তাকে ডাকতে বারন করতেন; কারন ছেলেটি হয়তো অসুস্থ, ঘুমের মধ্যে একটু আরাম পাচ্ছে। আবার আশ্রমের বাগান থেকে কাঁঠাল চুরি করে পালানোর সময় চোর ধরা পড়েছে। মহারাজের কাছে নিয়ে গেলে মানুষটির শাস্তি হিসাবে পেল চুরি করা কাঁঠাল, কিছু নগদ টাকা এবং ভবিষ্যতে আরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। কারন-সে অভাবে পড়ে ঐ কাজ করেছে। এখান থেকেই তাঁর মমত্ববোধের প্রমান পাওয়া যায়। প্রয়োজনে তিনি কঠোর হতেন, শাসন করেতেন; কিন্তু কখনোই কটু কথা বলতেন না। দু একটি কথা বুঝিয়ে দিতেন মানুষের অনভিপ্রেত কাজকর্মে তিনি কত ব্যথা পান।

প্রশাসক হিসেবে তাঁর মধ্যে যে গুনটি বিশেষভাবে চোখে পড়তো তা হলো- সবাইকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া। তাঁর মতে কারুর কাজে বেশী হস্তক্ষেপ করলে,

তাঁর মধ্যে সুষ্ঠভাবে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা বাড়বে না; কাজের প্রতি তাঁর অনীহা এসে যেতে পারে; সর্বোপরি সে কাজে আনন্দ পাবে না। তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করে প্রশংসনীয় সাফল্য এলে বলতেন-সবকিছু ঐ কর্মী করেছে, আমি কিছুই জানি না। তাঁর শিক্ষা প্রনালীতে সবি নেগেটভ কিছু ছিল না। কেউ পরীক্ষায় খারাপ করলে তাঁকে পরিশ্রম করার উপদেশ দিতেন। কাজকর্মে ভুল হলে তিনি বলতেন-"কাজ করতে গেলে ভুল হবে, ঐ নিয়ে মন খারাপ করো না। কাজকে ভালবাসবে, কাজের সুযোগ এলে তা এড়িয়ে যেও না, মনে করবে তুমি ঠাকুরের কৃপা পেয়েছ। তাই তিনি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছেন। অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করলে দেখবে কত আনন্দ হয়, এটা তোমার পুরস্কার"। কিন্তু কেন কলকাতায় শুরু করেছিলেন মহারাজ তার কর্মের ইতিহাস তা জেনে নেওয়া যাক। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যে কলকাতাকে দেখা দিয়েছিল তা ছিল অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ-এই তিন শতাব্দীর কলকাতার এক সংমিশ্রন। বিংশ শতকের উন্নত ও সম্ভ্রান্ত জনপথ বিবেকানন্দ রোড এবং সেন্ট্রাল এভিনিউ'র কলকাতার পাসাপাশি আমরা দেখেছি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের গড়ে ওঠা গঙ্গার তীর বরাবর পোস্তা, লালদীঘি এবং কেল্লা অঞ্চল আবার বড়বাজার চিপুর, আহিরীটোলা, শোভাবাজার, বাগবাজার, শ্যামবাজারের কলকাতা। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তন করেন এ মত একেবারে ভুল। 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ-এর অনেক আগে রচিত নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'কলিকাতা' এবং 'কালিঘাট' কে দুটি স্বতন্ত্র স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বহু প্রাচীন মানচিত্র ও নথিপত্রে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজরা কলকাতায় আসার বেশ কয়েকবছর আগে Vanden Brook নামে এক গুলন্দাজকৃত মানচিত্রে 'collecatta' নামে জায়গাটি প্রদর্শিত হয়েছে। এই জায়গাটি

পরে ইংরেজদের হাতে Calcutta হয়েছে। শ্রী অতুল সুর তাঁর গবেষনাধর্মী রচনা 'কলিকাতা' গ্রন্থে লিখেছেন "১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষমুখে চার্নক যখন সুতানুটি থেকে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন, তখন যেসব ঘরবাড়িতে তিনি ও কোম্পানীর অন্যান্য লোকজন বাস করতেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এসে দেখেন যে সেসব কিছুই নেই। সেগুলি হয় লুণ্ঠিত হয়েছে। আর নয়তো অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। মাত্র দু'চারখানা কুঁড়েঘর পড়ে আছে। সুতরাং বসবাসের জন্য ইংরেজদের আবাস্থলের অভাব অনুভূত হল। কাজেই এর পড়ে জব চার্নক নিশ্চয়ই কলকাতায় কিছু ঘরবাড়ি তৈরী করেছেন কোম্পানির লোকজনের থাকার জন্য। এই ঘটনাই পরবর্তীকালে কিংবদন্তীরূপে চলে এসেছে-"১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ জোব চার্নক কলকাতা নগরীর পত্তন করেন"। এটা নিছকই একটি কিংবদন্তী। ইতিহাসের পরীক্ষায় টেকে না। শুধু তাই নয়, ধারনাটি সম্পূর্ন ভুল। সেখানে জোব চার্নক আসার আগে থেকেই মানুষের বসত গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু মজার কথা হল এবঙ্গের প্রগতিশীল বামপন্থীরা এই প্রমানিত ভুল তথ্যটিকে ইতিহাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আশির দশকের শেষের দিক থেকেই হঠাৎ হৈচৈ শুরু করে দিলেন। রাজ্যের কোষাগারে অর্থানাশ করে নানা আলোচনা সভা, সভা সমিতি, মেলা উপলক্ষ্যে খানাপিনা হল, সরকারী গাড়ীর যথেচ্ছ ব্যবহা হল, জরুরি কার্জকর্ম শিকেয় তুলে দিয়ে আমোদ এবং বিনোদনে গুরুত্বপূর্ন সময়ের অপচয় করা হল এবং সবশেষে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে আগষ্ট বহু ধূমধাম করে রাজকোষের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তিনশ বছরের বৃদ্ধ কলকাতা মহানগরীর 'জন্মদিন' পালন করা হল-যাকে বলা যায় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ এবং বাঙালি জাতির প্রতি এক নির্মম উপহাস। এটা ছিল বাঙালির চোখে ধূলা দেবার জন্য বাম সরকারের এক নতুন ধাপ্পা। তখন এটার দরকার ছিল কারন বিদেশ থেকে শিল্পপতি ধরে আনার

ধাপ্পাটা তখন বেশ অনেক বছর পুরোনো হয়ে গেছে এবং জনমানসে প্রশ্ন তুলে ধরেছে। কারণ দশ বছরের চেষ্টায়ও কোনো বিদেশি শিল্পপতি আসেননি। একটা জুতসই নতুন ধাপ্পার প্রয়োজন ছিল বাঙালীর চোখে ধূলো দেবার জন্য। যে শহরে রাস্তা নেই, ফুটপাত নেই, আইনশৃঙ্খলা নেই, শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা এবং প্রশাসনিক যাবতীয় পরিকাঠামো রাজনৈতিক মতলববাজির নির্মম নিষ্পেষণে চূর্ণ করে ফেলা হয়েছে। যেখানে বেকারের সংখ্যা সারাদেশের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ আকার ধারন করেছে, যেখান থেকে মেধাবী, কৃতী ছেলেমেয়ে সব অন্য দেশে পালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎই সেই বৃদ্ধ মলিনতাময় নগরটির জন্মদিন পালনের জন্য এক বৃদ্ধ শাসক দৃষ্টিকটূভাবে হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন। এই 'সব কিছু নেই'-এর শহরের জন্মদিন প্রতিবছর পালন করা হয়েছে বহু আড়ম্বরে বহুল প্রচারে এবং রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করে। এটাই ছিল হয়তো দেশের মানুষের জন্য মার্কসীয় চিন্তাভাবনার বিধান।

ফিরে আসা যাক সেই পঞ্চাশের দশকের পুরানো কলকাতায়। পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলটি পুরোনো কলকাতার একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সে কলকাতা ছিল বেঙ্গল রেনেসাঁস-এর সাক্ষী। কাছেই ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সেখান থেকে বাঙ্গালী পেয়েছে বহুমুখী সংস্কৃতির অভ্যুদয় এবং অগ্রগতির মন্ত্র। পঞ্চাশের দশকে সঙ্গীত-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির দিক্‌পাল সব মানুষেরা সারাদেশের মধ্যে কলকাতাকে এক বিশেষ মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খন্ডিত নতুন বঙ্গের সে ছিল এক গৌরবময় যুগ। পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের কাছাকাছি ছিল আরও সব ঠাকুরদের বাড়ি-দর্পনারায়ণ, প্রসন্নকুমার, সৌরীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, কালীকৃষ্ণ ইত্যাদি সব ঠাকুরদেরবাড়ি। এইসব বাড়িগুলি ছিল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের তৈরী। ঐ সময়ের কোম্পানীর সঙ্গে নানাবিধ ব্যবসাসূত্রে ঐ ঠাকুররা প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের কাছেই ছিল

তারাসুন্দরী পার্ক, শীতকালে গঙ্গাসাগর মেলায় প্রাক্কালে এই পার্কে বহু সাধু সন্ন্যাসী আস্তানা তৈরী করতেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের বাড়ী এবং তৎকালীন ব্রাহ্মভক্তদের বাড়ী-সেগুলি সবই ছিল পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম থেকে সাত মাইলের মধ্যে। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলরাম বসু এবং গিরীশ চন্দ্র ঘোষের বাড়ি। অপরদিকে, পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের অল্পদূরত্বে আরও অনেক বাড়ি ছিল যেগুলির সঙ্গে কলকাতার ইতিহাসের নানা ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। আশ্রমের অদূরে রামবাগান অঞ্চলে ছিল রমেশচন্দ্র দত্তের বাড়ি-যিনি উচ্চপদাভিষিক্ত রাজপুরুষ হয়েও শাশ্বত সাধনায় ভাস্কর হয়ে রয়েছেন। এরই অনতিদূরে বিডন স্ট্রীটে ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ি-এঁরা দুবাই তৎকালীন কলকাতার বিশিষ্ট ধনী হয়েও বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঠনঠনে কালীবাড়ীর অদূরে ছিল শ্রীম এর বাড়ি, যিনি রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন এক অগ্রনী পুরুষ।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে বাঙালী জাতির নবজাগরনের ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বুৎপত্তির সঙ্গে জাতির প্রাচীন জ্ঞানভান্ডার এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের সম্যক ব্যবহার। এই উভয় কাজের অগ্রগতির জন্য তখনকার কলকাতায় গড়ে উঠেছিল নানা শিক্ষাকেন্দ্র এবং ধর্মসংস্থান। পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-পরে এগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু স্কুল-কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন তৎকালীন বাংলার মনীষীবৃন্দ, যাঁরা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্মকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সবই জড়াজড়ি করে রয়েছে ছোট্ট আয়তনের প্রাচীন কলকাতার মধ্যে। যার সীমানা শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা এবং মারাঠাখাল

থেকে ভাগীরথীর মধ্যে। তখনকার এই ছোট্ট কোলকাতা ছিল বাঙালী তথা সারাদেশের গৌরবভূমি-সবরকম মৌলিক চিন্তা ও কর্মের উৎসস্থল।

এবার স্বাধীনতাত্তর কালের প্রথম ছয়/সাত বছরের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ভারতের দুর্ভাগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহমানব বল্লভভাই প্যাটেল মারা গেলেন প্রায় শুরুতেই। দেশ শাসনের সার্বিক দায়িত্ব বর্তাল ভাবপ্রবণ জওহরলাল নেহেরুর উপর। ১৯৫০ সালে মারা গেলেন শ্রী অরবিন্দ এবং শরৎচন্দ্র বসু। ১৯৫০ সালের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের বর্বর মুসলমানের হাতে বিনা কারনেই হিন্দু হত্যা শুরু হল। বর্বরদের আক্রমনে লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রাণ হারালেন। বহু লক্ষ নিরাপরাধ হিন্দু সর্বহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হলেন-তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা ধর্মে হিন্দু। এর কোনো প্রতিকার তো দূরের কথা, কেউ প্রতিবাদও হল না। উল্টে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির নামে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে এক অমানবিক প্রতারনা করা হল। এরফলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী  আমাদের সংবিধান গ্রহন করা হল যে সংবিধানের এরই মধ্যে প্রায় চার কুড়ি বার সংশোধন করা হয়েছে এবং এই সংশোধনগুলি বেশীরভাগই হয়েছে দুরভিসন্ধিমূলক। দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ‘People of India’ র সুবিধার্থে নয় দেশবাসীর মন থেকে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং স্বাভিমান লোপ করার জন্য। এমনকি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের preamble পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীকৃত বিরোধীহীন সংসদ। সেখানে দুটি শব্দ-Socialist এবং secular সংযোজন করা হয়েছে স্বাধীনতালাভের ত্রিশবছর পরে এবং তা করা হয়েছে দুটি রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি-জেহাদী মুসলমান এবং কম্যুনিষ্টদের দেশবিরোধী কাজে মদত দেবার

জন্য। সংবিধানটি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের সর্বনাশ এবং দেশবৈরিতা করার জন্য একটি হাতিয়ার বিশেষ। সংবিধান তৈরী করার সময় সেখানে দেশের তৎকালীন অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু বিশেষ ধারা সংযোজন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই সেগুলি temporary বলে উল্লেখ করা ছিল। scheduled castes এবং scheduled Tribes -এর মানুষদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে স্পষ্ট বলা ছিল এই সুবিধাবলী কার্যকর থাকবে প্রথম বছর। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য জাতির পক্ষে চরম ক্ষতিকর সংবিধানের এই ধারাগুলিকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। দেশটা যে ধীরে ধীরে Islamised হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কোনো রাজনীতিবিদদের ভ্রুক্ষেপ নেই। বিশ্বের কোন দেশের সংবিধানে ভিন্ন ভিন্ন নাগরিকগোষ্ঠীর জন্য বাবা দেশের বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইনের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই সৃষ্টি ছাড়া দ্বিচারিতাই ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। একরকম ভাবেই বলা যায়, ধর্মের ভিত্তিতে বা জন্মের ভিত্তিতে জাতিকে খন্ডছিন্ন করবার দলিলটির নাম ভারতের সংবিধান। যেখানে দেখা যায়, সামাজিক আইন কানুন আলাদা, শিক্ষার ব্যবস্থা আলাদা। ১৯৫২ সালে এই সংবিধান অনুসারে ভারতের প্রথম সাধারন নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পর ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা তুঙ্গে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। মানুষ তখন নতুন গনতন্ত্রের মাধ্যমে এক শক্তিশালী উন্নত রাষ্ট্র গড়তে চলেছে। যেখানে সব নাগরিক দু'বেলা খেতে পাবেন, সবাই শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন, সবরকম ভেদাভেদ কমে যাবে বা লোপ পাবে। এইসব আশা আকাঙ্খা পূরনের প্রতিজ্ঞা দিয়েই সংবিধান শুরু হয়েছিল- 'We, the people of India , having solemnity resolved .....' ইত্যাদি। কিন্তু অল্পদিনেই সাধুসঙ্কল্প লোপ পেল, Solemnity-র কোনো চিহ্ন থাকল না - বেরিয়ে পড়ল

ক্ষমতা এবং অর্থলোলুপচার কদর্য রূপ। People of India হারিয়ে গেল অন্ধকারে। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, শ্রী অরবিন্দ ইত্যাদি মহাপুরুষদের ভাবচেতনাকে বাক্সবন্দী করে ফেলা হল, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে সেগুলি অধরা হয়ে রইল।

এরকম পরিস্থিতিতে পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমে মহারাজের কাছে যেসব নতুন ছেলেরা আসত তাদের বেশীরভাগই ছিল সাধারন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘরের, আপাতঃদৃষ্টিতে খুব সাধারন। কোন বিশেষত্ব প্রথমে চোখে আসত না। কিন্তু আশ্রম জীবনে ধীরে ধীরে তাদের অনেকেরই মধ্যেই নানা বৈশিষ্ট্যের, কখনও বা দুর্লভ প্রতিভার প্রকাশ দেখা যেত। মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য নরেন্দ্রপুরের ছেলেদের বেলায়ও। বেশীরভাগই সাধারন ঘরের অতি সাধারন ছেলে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা একটু বেশী মেধাবী। ওইসমস্ত  অলপ বয়স্ক ছেলেগুলি ছিল কত সরল, সুন্দর ও বুদ্ধিদীপ্ত-অনেকেরই আবার ওরই মধ্যে সঙ্কল্পের ছাপ। এই একই ট্রেডিশন পরবর্তী বছরগুলিতেও বজায় ছিল। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে প্রায় সব। কিন্তু পরে তাঁদের মধ্যে থেকে বেরিয়েছেন আদর্শ সন্ন্যাসী, দক্ষ প্রশাসক, কৃতী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সমাজসেবী, সংগঠক এবং আরও কত কিছু। আরও বড় কথা, তাঁরা আজ সবাই দেশের দায়িত্বপূর্ন নাগরিক, স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সবাই নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের কর্মপ্রেরনা এবং কর্মনিষ্ঠা বিভিন্ন কাজের অনুপ্রেরনা যোগায়। পাথুরিয়াঘাটা এবং নরেন্দ্রপুরের ছাত্ররা আজ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তার চাইতেও বড় কথা। কর্মক্ষেত্রে এঁরা সততা, আদর্শ এবং কর্তব্য নিষ্ঠার এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছেন।

এখন প্রশ্ন , কেমন করে এটা সম্ভব হল ? What is the secret ? সকলের সাফল্যের উৎস একই-মহারাজের নিরনর সান্নিধ্য। তাঁর প্রেরনা, পরামর্শ,

আশীর্বাদ এবং স্বার্থহীন ভালবাসা। পাথুরিয়াঘাটা নরেন্দ্রপুরে যারাই থেকেছে তাদের প্রত্যেকেরই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কাজে-কর্মে প্রায় সর্বদা মহারাজের চিন্তা মাথায় থাকত। কারন সবাকার সব কাজের জন্য মহারাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা থাকত। জ্ঞানে অজ্ঞানে তাই সবার মনে এভাবে মহারাজের চিন্তার একটা elevating effect নিরন্তন কাজ করত। হয়ত অনেক সময়সময় সেটা স্পষ্ট অনুভব করা যেত না। কিন্তু মনের উপর ঠিক কাজ করে যেত। এভাবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে কর্তব্যপরায়নতা। কর্মনিষ্ঠা , দায়বয়দ্ধতা, সততা প্রভৃতি দুর্লভ গুনগুলি অনেকের মধ্যেই ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকত। এরই প্রভাবে এসব ছেলেদের মধ্যে দেখা গেছে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর।

# গ্রন্থপঞ্জী

## ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জীঃ


*1.* Asaktnanda, Swami, *Ramkrishna Mission Blind Boy's Academy : Golden Jubilee Souvenir,* Ramkrishna Mission Ashrama, Nar-Drapur, Kolkata, 2007.

**2.** Giri, Prasanta Kumar, *A tribute to Swami Lokeswaranan-da centenary tributes*, Narendra-Pur Ramkrishna Mission Praktani, Kolkata, 2009.

**3.** Lokewarananda, Swami, *In Pictures A birth centenary tri-butes,* Namitam, Pelican press, kolkata, 2009.

**4.** Mandal, Kalipada, *UTSA Swami Lokeswara nanda co-mmeenmorative volume No. 41,* Ashrama chhatrabas Praktani, Narendrapur Phalguni press, South 24 Parganas, 1999.

**5.** Narendrapur Ramkrishna, Ashrama praktani — *A tribute to Swami Lokeswarananda centenary volume*, sishu sahitya Samsad privet Ltd, Kolkata, 2009.

**6.** Sen, Gupta, Probodh Chandra — *Swami Lokeswarananji*, Bani Sen-Gupta, Dattco, Kolkata, 2007.

**7.** Stocks, C. J, & Bose — *Ujjal*, Falgulni, Ramkrishna Mission Vidyalayaya, Narendra, 1967-1968.

## বাংলা গ্রন্থপঞ্জীঃ

**১.** অক্ষরানন্দ, স্বামী, — *উদ্দীপন,* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, ১৯৮৬

**২.** চক্রবর্তী আরুনি, ঘোস, ভাস্বর, দাসগুপ্ত, ভাস্বর, — *নরেন্দ্রপুর : একটি ইস্কুলের বৃত্তান্ত,* সাউথ সুপ্রয়াস, কলকাতা, ২০০৪

**৩.** চিদরূপানন্দ, স্বামী, — *স্বামী লোকেশ্বরানন্দ* , পুনশ্চ ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রেস, কলকাতা, ২০১০

৪. দাশ, অমিতাভ, *স্মৃতির আলোকে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,* ঐন্দ্রিতা (চন্দ্র) ভাদুরী, রিডার্স সার্ভিস, ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৮

৫. বলভদ্রানন্দ, স্বামী, *স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এক অনন্য জীবন,* নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, প্রাক্তনী শ্যাডো পয়েন্ট, কলকাতা, ২০১০

৬. বসু, বৈদ্যনাথ, *মহাজীবনের সান্নিধ্যে (দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতা, ২০০৬

৭. ভঞ্জ, ধীরেন্দ্রনাথ, *মহারাজ : একটি ছাত্র : গ্রাম কল্যান,* বর্নালী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬

৮. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টি-টিউট অব্ কালচার, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

৯. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *বাস্তব জীবনে আধ্যাত্মিকতা,* উদ্বোধক কার্যালয়,

কলকাতা, ২০০৮

**১০.** লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *বিশ্ববরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টি-টিউট অব্ কালচার, কলকাতা, ১৯৯৫

**১১.** লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *যুবনায়ক বিবেকানন্দ,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টি-টিউট অব্ কালচার, কলকাতা, ১৯৯৫

**১২.** লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *রামকৃষ্ণ পরমহংস,* সাহিত্য অকাডেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৯৯

**১৩.** লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, নানৃতম স্বামী লোকেশ্বরানন্দ জন্ম শতবর্ষ, উদযাপন কমিটি, সাইবার গ্রাফিক্স, কলকাতা, ২০০৯

**১৪.** লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *শতরূপে সারদা,* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৫

**১৫.** সুপর্নানন্দ, স্বামী, *চিরন্তনে পঁচাত্তর (১৯৩৮-২০১৩),* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব গোলপার্কে, কলকাতা, ২০১৬

## পত্রিকাঃ


১. শ্রদ্ধা, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ২০০৮.

2. উৎস নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ১৯৯৯

৩. সমাজ শিক্ষা লোকশিল্প পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ১৯৭৬-৭৭

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর প্রতিচ্ছবি

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়

নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি

ব্রহ্মানন্দ ভবন

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ